রাজনীতির প্যাঁচন।
বফর্স বনাম রাফেল

বড় গল্প। রাজন্যা

নতুন ধারাবাহিক।
যে শরীর ডাউনলোড হয়

নতুন কলম। সেরা পোস্ট

উত্তরে বাংলার মুক্ত কণ্ঠ

এখন ডুয়ার্স

৫ বছর পেরিয়ে

এপ্রিল ২০১৯। ২০ টাকা

জল। জঙ্গল। জনসত্ত্বা

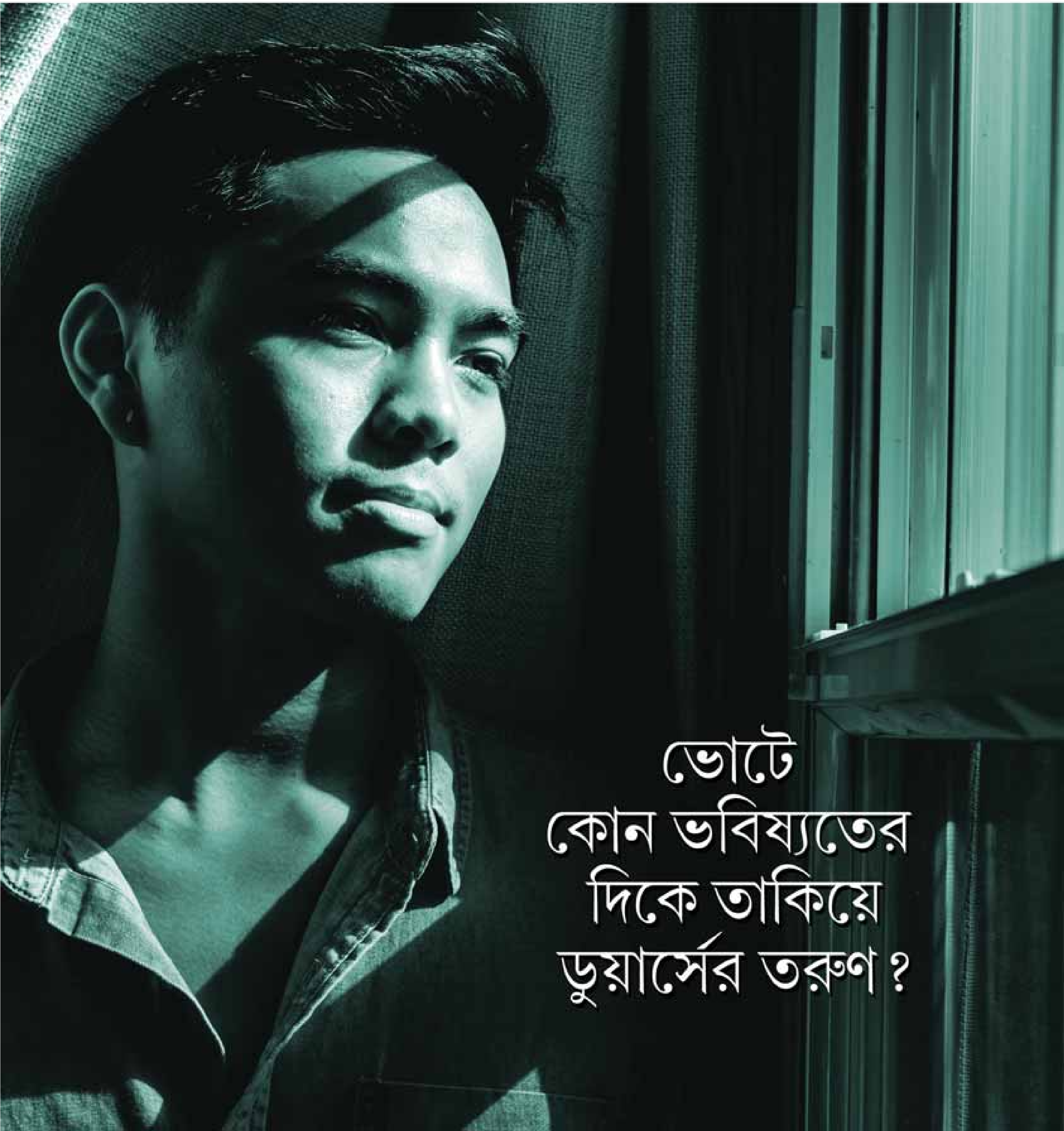

এখন ডুয়ার্স

এই সংখ্যায় যা আছে

সম্পাদকের কলমে ৩

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

ভোটে কোন ভবিষ্যৎ চায় ডুয়ার্সের তরুণ? ৬

রাজনীতির পাচন

রাফ্যেল এক নজিরবিহীন দুর্নীতি! ১০

রাফ্যেল বফর্সের মত মারণাস্ত্র হয়ে উঠল না কেন? ১১

পুবের ভারতে কংগ্রেস কই? ১৩

উত্তরপক্ষ

অবশেষে জলপাইগুড়িতে সার্কিট বেঞ্চ ১৬

শ্রীমতি ডুয়ার্স

শারীরিক নিগ্রহ হলে নির্যাতিতার কী কী করণীয়? ১৮

গান্ধারী শতপুত্রের জননী তবু নিঃস্ব এক নারী ২৩

আমার মেয়েবেলা ৩৭

ডুয়ার্স থেকে দূরে নয়

নুরানাঙের লড়াই ও ওরা তিনজন ২০

গল্প

রাজন্যা ২৪

ধারাবাহিক ডুয়ার্স

মহারাণী কথা ৩০

যে শরীর ডাউনলোড হয় ৩৩

নিয়মিত বিভাগ

খুচরো ৪, ফেসবুক পোস্ট ৫, রাসায়নিক রস ৩৮

এখন ডুয়ার্স পত্রিকা প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি
বিশ্বাস বুক এজেন্সি, বাটা গলি, হিলকার্ট রোড ৯৪৩৪৩২৭৩৪২
শিবমন্দির
অনুপ দাস, শিবমন্দির বাজার ৯৮৩২০২৯৫১৪
জলপাইগুড়ি
ভবতোষ ভৌমিক, কমার্স কলেজের বিপরীতে ৯৭৩৩২৪৬৯১৩
মালবাজার
সম্রাট (হোম ডেলিভারি) ৯৩৩২০০৫৮৬৫
চালসা
দিলীপ সরকার, চালসা মোড় ৯৭৭৫৪১৫১৪৪
বিন্নাগুড়ি
রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল ৯৪৩৪৮০৯৫৯০
বীরপাড়া
বরুন ঘোষ, পোকিসা ৯৫৯৩৩৫৪১৫২
মাদারিহাট
জগৎ চৌধুরী (হোম ডেলিভারি) ৯৭৪৯৭২৫৭৮১
লাটাগুড়ি
সৌমেন (হোম ডেলিভারি) ৯০০২৪০৯৮৯৩
ময়নাগুড়ি
দেবাশিষ বসুভাট ৯৯৩৩১৯০৮৫৮
ফালাকাটা
অমল চন্দ্র পাল ৯৪৩৪৪১২৬৪৯
তুফানগঞ্জ
আনন্দবাজার বুক স্টল ৯৩৩৩৬৮৮৬৭১
দিনহাটা
হরিপদ রায় ৯৯৩২৬৩৯০৬৮
আলিপুরদুয়ার
দীপক কুমার হোড়, কলেজ হল্ট ৭৬৭৯৮৯৫৩০৭
কোচবিহার
জয়ন্ত দাস, বড় পোস্ট অফিসের বিপরীতে ৯৪৩৪২১৭০৮৪
মালদা
অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি ৯৯৩২৯৬৭৯৯১
বালুরঘাট
মাধববাবু ৯১২৬২৬০৬৬৩

ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন ৯৮৩০৪১০৮০৮

কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক বিশাল বুক সেন্টার ৪০৬৪৪০৯৭

এখন ডুয়ার্স-এ লেখা পাঠান
হাতে লিখে নয়, টাইপ করে

ডুয়ার্স সংক্রান্ত আপনার কোনও লেখা থাকলে টাইপ করে পাঠান। আপনার লেখা সম্পাদকমন্ডলীর পছন্দ হলে এই পত্রিকায় তা ছাপা হবে। লেখার বিষয়বস্তুর উপর ছবি থাকলে অবশ্যই পাঠাবেন। লেখা পাঠানোর ঠিকানা এখন ডুয়ার্স। শান্তি পাড়া। অনিমা লজের পেছনে। জলপাইগুড়ি ৭৩৫১০১। অথবা মেল করতে পারেন নিচের মেল আইডি-তে

editor.ekhonduars@ yahoo.com

এখন ডুয়ার্স

ডুয়ার্সের নিজস্ব বই ও পত্রিকা

পরিবেশ। পরিকাঠামো। পর্যটন
জঙ্গল। জনসত্তা
শিক্ষা। স্বাস্থ্য। সাহিত্য। সংস্কৃতি

এখন ডুয়ার্স

ষষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, এপ্রিল ২০১৯

সম্পাদনা ও প্রকাশনা
প্রদোষ রঞ্জন সাহা

ডুয়ার্সের ব্যুরো প্রধান
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদনা
শ্বেতা সরখেল

অলংকরণ
শান্তনু সরকার

সার্কুলেশন
দেবজ্যোতি কর
দিলীপ বড়ুয়া

মুদ্রণ অ্যালবাট্রস

ইমেল
ekhonduars@yahoo.com

প্রচ্ছদ
আরএন মিলস

ডুয়ার্সে ব্যুরো অফিস।
অনিমা ভবন। শান্তি পাড়া।
জলপাইগুড়ি ৭৩৫১০১

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে। এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

সম্পাদকের কলমে

পাঁচ বছর পেরিয়ে পৌঁছব কোথায় আমরা?

একটা কাকতালীয় সমাপতনের কথা না বলে শুরুই করতে পারছি না! টানা দশ বছরের সনিয়া-কংগ্রেস চালিত সরকারের অবসানে যে সময় মোদি সরকার দিল্লির তখতে বসেছিল, সেই সময়ই জন্মেছিল 'এখন ডুয়ার্স'। সেদিন যদিও আমরা আ-মোদি-ত হই নি বিশেষ একটা, হওয়ার মত অবস্থাও ছিল না, তবে একটি বাণিজ্যিক প্রকাশনার অঙ্গ হিসেবে একটি পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ করা, তাও আবার টানা পাঁচ বছর, একটি সরকার চালানোর চাইতে বেশি কঠিন না হলেও সহজ নয়, এটুকু হলফ করেই বলতে পারি। উত্তরবঙ্গে কবি-সাহিত্যিকের অভাব নেই, তবু গোড়ার দিকে আমাদের মনে হয়েছিল, অর্থ বা বিজ্ঞাপন বা পাঠকের অভাবে নয়, পত্রিকা যদি বন্ধ হয়ে যায় তবে তা হতে পারে একমাত্র লেখকের অভাবেই! আমরা যেহেতু শুরু থেকেই কবিতা-গল্প ছাপার ব্যাপারে নিরুৎসাহী ছিলাম, অতএব এতে এটাই নাকি হওয়াটা স্বাভাবিক! কারণ এক, কোচবিহার থেকে কালিম্পং বা সংকোশ থেকে তিস্তা অবধি ভুখণ্ডে এমন 'কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ম্যাগাজিন' দ্বিতীয়টি ছিল না, ফলে লেখার বা পড়ার অভ্যেস বলতে কলকাতার গুটিকয়েক পত্রিকা। আর দুই, উত্তরের সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিকটির বদান্যতায় যে সব লেখক-সাংবাদিক তৈরি হয়েছিলেন তাঁরা জীবিকার তাগিদে সবাই প্রায় কলকাতায় বা অন্যত্র চলে গেছেন। আনন্দবাজার সংস্থার মত বই ও অন্যান্য সাময়িক পত্র প্রকাশের আলাদা ব্যবস্থা না থাকায় সে সব গুণীজনদের ধরে রাখা যায় নি। এমতবস্থাতেও যারা রয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা অভিমানে বা হতাশায় প্রায় নীরব হয়ে কিংবা ছোট ছোট শহরে বাকি দুনিয়া থেকে পিঠ ফিরিয়ে নিজের মনে টুকিটাকি লেখালেখিতে নিমগ্ন ছিলেন।

এই পাঁচ বছরে আমরা পত্রিকার সার্কুলেশন সংখ্যা উল্লেখযোগ্য বাড়াতে পারি নি ঠিকই, কিন্তু এই সময়ে 'এখন ডুয়ার্স' পত্রিকা ও প্রকাশনা সংস্থা তার পাঠককে খুঁজে পেয়েছে। একই সঙ্গে প্রত্যন্তের সেই সমস্ত কলমচিদের সঙ্গে একে একে সংযোগ তৈরি করা হচ্ছে। তাঁদের কলমে উঠে আসছে সাম্প্রতিক ডুয়ার্সের নানান স্বল্পালোকিত দিক, অন্ধকারে দীর্ঘকাল থাকার পর নতুন আলোর ইঙ্গিত, সেই সঙ্গে ইকো পর্যটনে যোগ হচ্ছে বাংলার এই ভুখণ্ডের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। একই সঙ্গে আমরা মনযোগী হয়েছি নতুন প্রজন্মের পাঠক ও লেখক তৈরিতে। এই সময় 'এখন ডুয়ার্স' পত্রিকার পাঠককুলের সিংহভাগই চল্লিশের উপরে। কিন্তু সম্প্রতি আমরা অবাক হয়েছি তরুণতম পাঠকের মধ্যে উত্তরের জনা কয়েক গদ্য লেখকের জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে, যা আমাদের উজ্জীবিত করেছে সন্দেহ নেই। নতুনদের পাত্তা না দেওয়ার ফল হিসেবে রাজনীতির অঙ্গনে গত পাঁচ বছরে বামপন্থী দলগুলির যে করুণ অবস্থা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি তা থেকে সবাই একটি প্রয়োজনীয় শিক্ষা নিতে পারে, উত্তরসূরী তৈরি না করলে কোনও প্রতিষ্ঠান দীর্ঘজীবি হয় না। অতএব প্রথম পাঁচ পেরিয়ে আমাদের সবচেয়ে বড় বাস্তব অভিজ্ঞতা বলতে গেলে এটাই— যত দ্রুত সম্ভব নতুন প্রজন্মের হাতে সঁপে দিতে হবে দায়িত্বভার।

যে সময় আমরা ষষ্ঠ বর্ষের যাত্রা শুরু করলাম সেটি দেশের রাজনীতিতে এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ। দেশের শাসনভার নিতে চলেছে নতুন সরকার। সাধারণ শিক্ষিত অশিক্ষিত মানুষ বছরভর ট্যাক্সের বোঝা বয়ে বয়ে পরিশ্রান্ত, এখন তাদের গ্যালারিতে বসে খেলা দেখবার সময়! তারপর একটা সুইচ টিপে তারাই নির্ধারণ করবেন আসছে পাঁচ বছর কারা থাকবে মসনদে! এবারের নির্বাচনে নতুন ভোটারের সংখ্যা সরকার গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে কোনও সন্দেহ নেই। কারণ তারা জানে, এই গণতান্ত্রিক কাঠামোয় মানুষকে বেছে নিতে হবে খারাপের মধ্য থেকেই যে কোনও একটিকে, ভাল-র কথা না ভাবাই ভাল। সোশ্যাল মিডিয়া তথা ইন্টারনেটে ভোটের নীরব প্রচার শব্দদূষণ বা দৃশ্যদূষণ থেকে অনেকটাই রক্ষা করেছে বলে অনেকের অভিমত, কিন্তু প্রাক নির্বাচনী উত্তেজনা এবার যে অনেক কম তা-ও অস্বীকার করা যায় না। পাঁচ বছর আগের নির্বাচনে 'নোটা'-য় পড়েছিল ষাট লক্ষ ভোট, এবার তা কত-য় পৌছায় সেটাও দেখবার ও ভাববার বিষয় বইকি।

পাঁচ বছর আগে যা চোখে সেভাবে পড়ে নি তা হল প্রিন্ট নিউজ মিডিয়া বা মুদ্রণ সংবাদ মাধ্যমের নীতিহীন অধোগতি। আন্তর্জালের সৌজন্যে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার আগ্রাসী বিস্তারের ফলে মুদ্রণ মাধ্যম ক্রমাগত পেছনের সারিতে চলে যাচ্ছে ঠিক কথা কিন্তু তাই বলে তাদের প্রয়োজনীয়তা কখনই ফুরিয়ে যেতে পারে না। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে প্রিন্ট মিডিয়া তার আঙ্গিক বদলে নতুন জায়গা করে নিতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এবার আমাদের জাতীয় দলগুলির প্রচার-অভিনবত্বে প্রিন্ট মিডিয়া গুরুত্ব পাচ্ছে কম, কারণ তাদের জনমত গঠনের ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে অনেকটাই নিস্প্রভ। ফলত অস্তিত্ব রক্ষার দায়েই তারা আজ স্তাবকতার আশ্রয় নিচ্ছে, সরকারি বিজ্ঞাপনের বাধ্যবাধকতায় অনুগ্রাহী সাংবাদিকের কলম দিনকে দিন ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে। তাই আজ আমরা দেখতে পাই মন্ত্রীমশাই কোনও সাংবাদিককে প্রকাশ্যে গালিগালাজের স্পর্ধা দেখান, কারণ তিনি ভালই জানেন অন্যান্য কাগজ এ নিয়ে একটি লাইনও খরচ করবে না! মুদ্রণ মাধ্যমের এই নিদারুণ অবনমনে আমরা ব্যথিত সন্দেহ নেই। পাঁচ বছর পরে 'এখন ডুয়ার্স' ছেপে বের করবার প্রয়োজনীয়তা আদৌ থাকবে কিনা তা এখনই বলা কঠিন, যেমন এখনই অনুমান করা দুষ্কর পাঁচ বছর পরে দেশ কোথায় পৌঁছবে! কিন্তু কোনও সরকারি অনুগ্রহ ছাড়াই 'এখন ডুয়ার্স' পত্রিকা প্রকাশ চালিয়ে যাব সেই কঠিন সিদ্ধান্তটি আমরা এইবেলাতেই নিয়ে নিলাম।

সবাইকে বাংলা নববর্ষের আগাম শুভেচ্ছা জানাই!

ভাবিয়াছিলাম কলিকা গ্রাম কক্ষে সমিতির সদস্যরা নন্ পলিটিকাল। কিন্তু ভোট আসিতেই দেখি সবাই ফুলে-হাতে-হাতুড়িতে ভাগ হইয়া ভয়ানক কোন্দল করিতেছে। যদিও এক ছিলিমেই খাইতেছে সকলে। কিন্তু তাহারপর যা ঝগড়া বাধাইতেছে তাহা যেন শান্তির পায়রা কাটিয়া রসুন-পেঁয়াজ দিয়া ভক্ষণ। সব দেখিয়া শান্তির সন্ধানে মালবাজার যাইয়া শুনিলাম, চাহিদা নাই।

নাই পতাকামাই

মালবাজারে শুনিলাম পাব্লিক তাঁর প্রিয় পার্টির পতাকা-টি শার্ট ইত্যাদি কিনিতে মোটেই আগ্রহ দেখাইতেছে না। তাহলে মিটিং-মিছিলে এত যে ভোটার পদ্মটপ, তৃণফতুয়া, গেরুয়া ফেট্টি, ঘাসফুল বেনিয়ান পরিয়া হুঙ্কার দিতেছে, তাহা আসে কোথা হইতে? প্রশ্ন শুনিয়া কর্মি-কমরেড-ভক্ত-দেশদ্রোহী সকলে একবাক্যে কহিল, আরে মশয়! ইলেকশান করিতেছি বলিয়া খচ্চা করিব কেন? দরকারে জাঙ্গিয়াতে সিম্বল লইয়া ঘুরিব কিন্তু পার্টিকে কিনিয়া দিতে হইবে। না দিলে বিরোধি দলের পুরাতন জামা পরিয়া মিছিলে হাঁটিব। তখন না কিনিয়া যাইবে কোথায়? হায় হায়! এ কী আনুগত্যবোধ দেখিলাম! জামা না পাইলে বিরোধি খাতায় নাম লিখাইবি নাকি? তারপর দেখিলাম এক মহিলা আধা গেরুয়া আধা সবুজ শাড়ি পরিয়া যাইতেছে। কহিলাম, এ কী দ্বিচারিতা? সে বলিল, মর গে! দুই ফুলের দুই রঙা শাড়ি পাইয়া ভুলবশতঃ বরের ধুতির সহিত কাচিয়া দিয়াছিলাম। ফুলের শাড়ি সাদা হইয়া গিয়াছে আর ধুতি হইয়াছে দোরঙা শাড়ি। হায়! ইহার পর মালবাজারে পতাকা কিনিবে কোন পাগল?

বাঘডগ

আইভিল চা বাগানের কিশোর যেখানেই যাইত সঙ্গে থাকিত তাঁহার সারমেয় 'টাইগার'। তা ব্যাঘ্রতুল্য কুত্তা বটে! সেদিন কিশোর গিয়াছে গরু চরাইতে অথবা ঘুরিয়া বেড়াইতে। হঠাৎ হামলা! একেবারে 'পিঠে এসে পড়ে থাবা/ গেল বুঝি ওরে বাবা!' হতচ্ছাড়া চিতা মিসাইলের মত পড়ল কিশোরের পিঠে। মরিয়াই যাইত, কিন্তু সেইখানে ছিল 'টাইগার দ্য কুত্তা'! তাহার ভৌ শুনিয়া চিতা ভাবিল আরো বড় চিতা আসিয়াছে। ইহার পরেও সে পলায়ন করিল না দেখিয়া কুত্তা দিল লাফ। ঘ্যাঁক ঘ্যাঁক করিয়া গোটা কয়েক দংশন উপহার দিতেই চিতা ভ্যানিস! মনে হয় সোজা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়া অ্যান্টি র‍্যাবিস লইয়া জঙ্গলে ফিরিয়া হাঁফাইতেছিল। চিতা কী করিয়া জানিবে সে কুত্তার এলাকায় প্রবেশ করিয়া আসলে ভুল করিয়াছিল। শাস্ত্রে বলে, আপুন গলি মে ডগ ইজ টাইগার! ভৌ ইজ হালুম!

আলু-আঁধারের কথা

ডুয়ার্সে এইবার আলুর বান ডাকিয়াছে। আলু আমার আলু ওগো আলু ডুয়ার্স ভরা। ক্ষেতের পর ক্ষেত আলুকিত। আলুকের এই ঝর্নাধারায় কৃষক গিয়াছে ভাসিয়া। কিন্তু আলুকে জন্ম দিয়াই দায়িত্ব ফুরায় না। তাহাকে হিমঘরে রাখিয়া মানুষ করিতে হয়। কিন্তু হিমঘরে সিট পাওয়া লইয়া মহা কালোবাজারি হইতেছে। প্যাকেট পিছু বন্ডে মূল্যের দ্বিগুন হাঁকিতেছে হিমঘরে হেড মাস্টারেরা। ফলে ভাল ভাল ইংলিশ মিডিয়ম হিমঘরে আলুকে ভর্তি করা মহা দায়! তাই গার্জিয়ানরা আলুর ফিউচার লইয়া মহা চিন্তিত। তাঁহাদের আলুক দেখাইতেছে। মানে আলুর ন্যায় লুক। কবি এই ভাবিয়াই সেই কবে লিখিয়াছিলেন 'আলুকের নিচেই অন্ধকার'।

পাব্লিকথা

তা যাহাই বলুন, আম পাব্লিকের মত পাজি আর দেখি না। কর্মিরা রোদে ভাসিয়া, জলে ডুবিয়া, ঝড়ে কাঁপিয়া ভোটাইতেছে। তাঁহাদের মধ্যাহ্ন ভোজ দেখাইবে বলিয়া টিভির লোকেরা সকাল হইতে না খাইয়া রেস্টোরান্টে ক্যামেরা তাক করিয়া আছে। কিন্তু পাব্লিকের কি একটুও সহানুভূতি দেখিলাম? চায়ের দোকানে বিড়ি হাতে তর্ক করা ছাড়া তাঁহারা আর কি কিছু করিতেছে? এক দোকানে চা খাইতে গিয়া দেখি মহাবাকযুদ্ধ চলিতেছে। বিতর্কের বিষয় সবুজ জাঙ্গিয়া পরিয়া গেরুয়া টিমকে ভোট মারা অবৈধ কি না। শুনিয়া দোকানান্তরে গিয়া দেখি সেইখানে প্রায় হাতাহাতি লাগো লাগো। স্থানীয় ডাকসাইটে নেতা বর্তমানে কোন দলে, তাহা লইয়া ঝগড়া চলিতেছে। সকলেই সব দলে থাকিবার প্রমাণ দিতেছে। চা ছাড়িয়া চপ খাইতে গিয়া পড়িলাম আরেক ঝামেলায়। অনুপ্রাণিত চপ বলিয়া কিছু হয় কি না তাহা লইয়া আমার মত জানিতে চাওয়া হইল। আমি সাধক মানুষ। সব দলকেই সমান চক্ষে দেখি। নোটায় ভোট মারি। চা-চপ-সিঙারা খাইতে গিয়া তর্কে জড়াইয়া আমার কী লাভ? কিন্তু পাব্লিকেরও বলিহারি। সারা বছর কটাক্ষ করিস। এখন ভোটের আগে একটু চুপ কর!

বক্তা কম্পিটিশন

ভোটের কালে মাইক ধরিয়া ফাটাইয়া বক্তৃতা না করিতে পারিলে কি ভোট জমে? কিন্তু বক্তা বাড়ন্ত। তাই চাই টাটকা টাটকা বক্তা। কিন্তু তাহাদের খুঁজিবার উপায়? ডাবগ্রামের ঘাসফুলেরা তাই কম্পিটিশন চালু করিয়াছেন। বক্তৃতা কম্পিটিশনে পাস করিলেই মিলিবে মঞ্চ আর মাইক। পুরস্কার পাইলে মহা মহা মঞ্চ কাঁপাইবার সুযোগ। ইহাতে নিশ্চয়ই বক্তার আকাল মিটিবে। তবে শুরুতেই নবীন বক্তাদের লোকসভার আসরে নামাইয়া দিলে চাপ লইতে পারিবে? কম্পিটিশন পঞ্চায়েতের আগে শুরু করিলে হইত না? শুনিয়া কে জানি কহিল, তখন বোমা থ্রো কম্পিটিশন বেশি কাজে দিবে। তদুপরি বিনা প্রতিযোগিতায় জিতিয়া গেলে বক্তার কী দরকার? এইবার দেখা যাউক প্রখ্যাত কবি পুরন্দর ভাটের অপ্রকাশিত কবিতায় কী পাওয়া গেল।

১) ডুয়ার্সে সব সিট লইবে মুকুল/ ইহা শুনি
হা হা রবে হাসে তৃণমূল।

২) হলদিবাড়িতে ফলে অনেক এঁচোর/
ভিনদেশে যায় চাপি প্লেনের ভেতর।

৩) ডুয়ার্সে কোথা জানি বইমেলা হল/ হায়
সেথা কবি আসি কবিরে ঠ্যাঙাল।

৪) সাগরদীঘির জলে/ মাথা ডুবাইয়া র'লে/
মগজ হইবে দারুন শীতল/ দিলীপরে রবি বলে।

৫) ডুয়ার্স কন্যা আছে আলিপুর ধামে/ সেইখানে
দুটি লিফট নাহি ওঠে-নামে।

কলম সিং

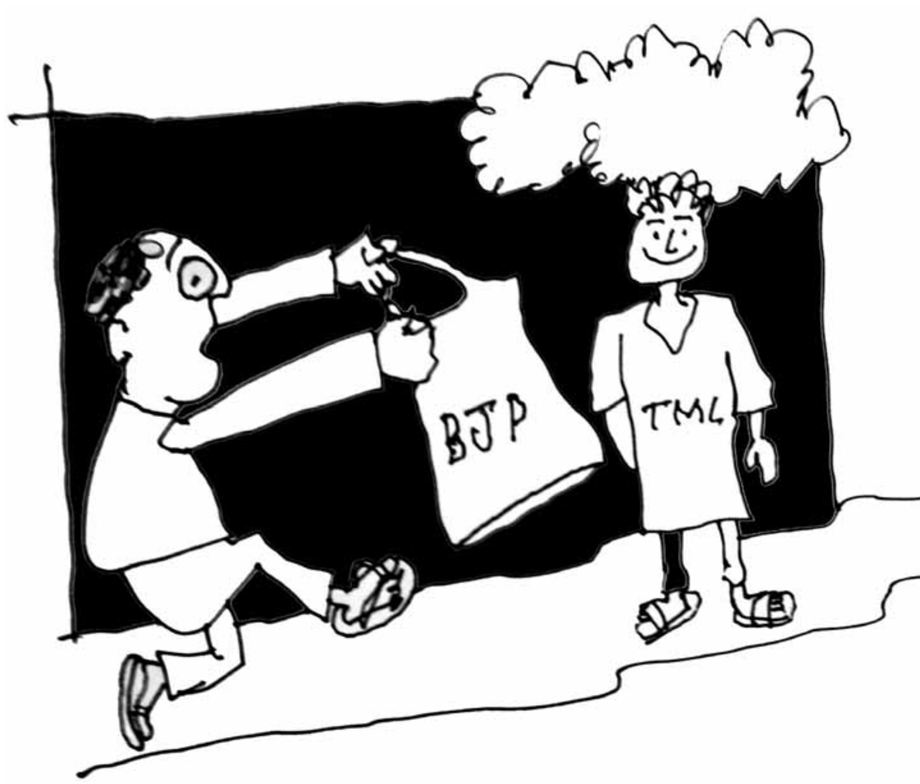

সেরা পোস্ট

পিরিওডসএর প্রোবাবল ডেট মনে থাকে না কোনওকালেই, তাই আমার হবু ডাক্তার প্রেমিক পাক্কা এক বছরের ডেটচার্ট তৈরি করে নিজের মোবাইলে সেট করে রেখেছিল আর আমাকেও প্রতি মাসে সেটা মনে করিয়ে দিত... অবাক কান্ড! সে একজন পুরুষ!

শীতের সন্ধে নেমেছে সবে... গ্রামে একটা পুকুরের ধারে বসে বকবক করছি কয়েকজনের সাথে... হঠাৎ চশমাটা হাতে নিয়ে খেলতে খেলতে সেটা পড়ে গেল জলে! আমি কিছু বলার আগেই কনকনে ঠান্ডা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে যে তুলে এনেছিল আমার হাই পাওয়ারের চশমা... সে কিন্তু একটা ছেলে!

স্নান করে উঠে বাবার পায়ের পাতার উপর দাঁড়িয়ে চুল মুছিয়ে নেওয়াটা ধরি না, তবে বাড়ির একটা বিয়ের অনুষ্ঠানে মা-কাকিমারা নিজেরা সাজতে ব্যস্ত থাকায় আমায় শাড়ি পরিয়ে সাজিয়ে দিয়েছিল ছোটকাকু আর ভাই মিলে স্পষ্ট মনে আছে... অদ্ভুত! ওরাও নাকি পুরুষমানুষ!

আশ্চর্যের আরও আছে বাকি!

বাসের অকথ্য ভিড়ে স্কুলের সিন্থেটিক শাড়িপরা আমি যখন ঘেমে নেয়ে ভারী অর্গানিকের বই আর ব্যাগ নিয়ে বসে থাকা এক কাকিমার কাছে ক্রমাগত গঞ্জনা শুনছি, তখন যিনি নিজের সিট ছেড়ে উঠে আমায় বসতে বলেছিলেন, তিনি একজন পুরুষ...

একদিন অতর্কিতে ব্যাচে ব্রেশিয়ারের স্ট্র্যাপ বেরিয়ে যাওয়ায় সব মেয়েদের হাসাহাসির মাঝে যে বন্ধুটা আমাকে ইশারায় ব্যাপারটা জানিয়েছিল, সে একজন পুরুষ...

সর্দি মুছতে দেখলে যখন আমার বান্ধবীদের সহজাত প্রতিক্রিয়া হয় 'ও ম্যা গো!', তখন যে বন্ধুটা প্রতিবাদ করে বলে, 'তোদের কি কখনও ঠান্ডা লাগে না?' ...সেও একজন পুরুষ...

আমার হঠাৎ বেরিয়ে পড়ার পাগলামিতে, নাক-চুল টেনে মারপিট করার দুষ্টুমিতে, 'ইঁদুর-বাঁদর-জানোয়ার-শাঁকচুন্নী' বলার খুনসুটিতে, ক্রমাগত জ্বালাতন আর ঝগড়ার খ্যাপামিতে আর শেষ বিকেলের হলুদ আলোয় কাঁধে মাথা রাখার স্বস্তি জুড়ে যারা আছে তারা প্রত্যেকেই তো পুরুষ...

জাতটা এমন যে, চোখের জলটা মনের কোণে বারুদ হয়ে জ্বলতে দেয়... জাতটা এমন যে, চাকরির চেষ্টায় হন্যে হয়ে ভালবাসাকেও যেতে দেয়! ...জাতটা এমন যে, মাসের শেষ সঞ্চয়টুকু জমিয়ে প্রিয় মানুষের জন্য কিনে আনে গিফট... জাতটা এমন যে, মায়ের কথা বলতে গিয়ে বুড়ো বয়সেও কাঁদতে পারে...

এখন, যদি বলেন মাতাল, দাঁতাল, শয়তান, ইভটিজার, ধর্ষকদের কথা কেন এড়িয়ে যাচ্ছি, তাহলে বলব চোখটা আধবোজা নয়, পুরোটা খুলে দেখতে... কারণ, সবাই সমান হয় না। তাছাড়া, ধর্ষণ তো মনেরও হয়।

আচ্ছা, একটু ভেবে সত্যি করে বলুন তো, 'আমার যদি একটা ছেলে থাকত...' কিংবা 'তোমার কোনও ভাই বা দাদা নেই!!!' এইরকম বাক্যগুলো মহিলাদের মুখেই কি বেশি শোনেন নি?

মৌসুমি চৌধুরী দাসগুপ্ত, ২৭ মার্চ ২০১৯

একটি দাবিপত্র

—তার মানে আমার গ্রেস, আমার পার্সোনালিটি, আমার ফিগার নিয়ে তুমি এতদিন যা বলে এসেছ, সব মিথ্যে ?

গার্ল, তুমি বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলে তোমাকে তিরিশের বেশি মনে হয় না। তুমি নিজে জান না তোমার বয়স কত হল? হাঃ, তুমি সেগুলো বিশ্বাস করতে? তোমার লুক, তোমার সেক্স অ্যাপিল, তোমার হাস্‌কি ভয়েস —বিখ্যাত নায়িকাদের সঙ্গে কমপেয়ার করতাম। তুমি মোমের মত গলে যেতে। তোমার চোখে আনন্দ জ্বলে উঠত।

—সেই চালাক শেয়ালের মত মিথ্যে স্তুতিবাদে আমাকে বোকা বানাতে চেয়েছ। নির্লজ্জ প্রশংসা করতে আমার শরীরের। ভেবেছিলে বোকা কাকের মত আমিও তোমাকে গান শোনাব। আমার নিজস্ব মাংস মাটিতে পড়ে গেলে তুমি হিংস্র উল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

—আমি তো তোমাকেও আনন্দ দিতে চেয়েছি। কখনও কখনও আমার নির্লজ্জ ভাষায় তুমি কুঁকড়ে যেতে। আমি টের পেতাম তুমি ভেতরে ভেতরে শক্ত হয়ে যাচ্ছ। তখন আবার আমি অন্য খেলা শুরু করতাম। শক্ত একটা দেয়াল ভাঙার খেলা। প্রতিরোধের সেই প্রাচীর ভেঙে ফেলার প্লেজার তোমরা কোনও দিনই বুঝবে না।

—অলীক ভ্রমণের সুখ পেতে চেয়েছ তুমি। মিথ্যে সুন্দর বানাতে চেয়েছ।

—আমি সুখ চেয়েছি নীপা। তোমরা কীসে খুশি হও, কোন কথায় বুকে ঝাঁপিয়ে পড় —আমরা জানি। সেই খেলায় তুমিও কি আনন্দ পাওনি?

—না অঞ্জন, তোমরা সব জান না। তোমরা তীক্ষ্ণ নখ আর দাঁতের ব্যবহারকে মনে কর এই তো অধিকার স্থাপিত হল। মনে কর চূড়ান্ত জয় অর্জন করা হয়ে গেছে। কী বোকা, কী বোকা তোমরা। মাংসের ওপারে রহস্যময় এক উপত্যকার খোঁজ —হায় বুঝি তার খবর পেলে না। নিজেদের যত চালাক মনে কর, তত বোকা হয়ে যাও। গভীরে যাওয়ার একটাই মানে বোঝ তোমরা।

—এ কী নীপা, এখন আবার তুমি কোথায় বেরোচ্ছ?

—বেড়াতে এসে ঘরে বসে থাকার কোনও মানে হয় না। আজ আমি সমুদ্রের পারে প্যারা-গ্লাইডিং করব। একদম একা। একটা প্যারাস্যুটে চড়ে সমুদ্র দেখব, পৃথিবী দেখব। মনে হবে অর্ধেক নয়, পুরো আকাশটাই আমার।

বিপুল দাস, ১৯মার্চ ২০১৯

দিনহাটা বয়েজ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সেক্রেটারির চিঠি পেয়ে উত্তেজনায় বুক ধড়াস ধড়াস করছিল। চিঠিতে বলা ছিল, এবারের হিতেন নাগ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কারের জন্য আমার নাম ভেবেছেন ওঁরা।

আগে দিনহাটা কখনও না গেলেও লোকমুখে শুনেছিলাম ওঁরা প্রতি দু বছর অন্তর বড় মাপের সাহিত্য সম্মেলন আয়োজন করে আসছেন। তবে বলতে দ্বিধা নেই, নিজের স্বল্পবুদ্ধি দিয়ে এতদিন ভাবতাম, সাহিত্য আর ক্লাব এই দুটো শব্দ যেন তেল আর জল, মিশ খায় না কিছুতেই। কোচবিহার জেলার এই মহকুমা শহরে পা রেখে বুঝতে পারলাম এতকাল কতটা ভুল জানতাম!

হিতেন নাগ ছিলেন একজন বিশিষ্ট সাহিত্য ব্যক্তিত্ব। সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি তিনি শুরু করেছিলেন বড় মাপের সাহিত্য সম্মেলনের। স্বর্গীয় পিতৃদেবের আরব্ধ স্বপ্নকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন তাঁর কৃতী পুত্র অনির্বাণ নাগ। তিনিই আগ্রহ নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন সব। পুরোদস্তুর একটা স্কুল বিল্ডিংয়ের মত জায়গা নিয়ে এই ক্লাব। সামনে বিরাট জায়গা। নিচতলায় অনেকটা পরিসর নিয়ে লাইব্রেরি। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন প্রতিটি ঘরদোর। রুচিশীল গৃহস্থ বাড়িতে যেমন থাকে, চমৎকার সব পেন্টিং দিয়ে ক্লাবের ঘরগুলি সাজানো। হোটেল বা লজের মত পুরো দোতলা জুড়ে থাকার ব্যবস্থা। না, আর পাঁচটা ক্লাবের মত এই ক্লাব কোনও ধর্মীয় উৎসবে সামিল হয় না। বরং প্রচলিত পথের উল্টোদিকে হেঁটে এই ক্লাব মানবপুজোর আয়োজন করে। যেখানে গরিবগুর্বো মানুষদের দেবতাজ্ঞানে পুজো করা হয়। সকলকে পেট পুরে ভোজন করানোর পর দান করা হয় শীতবস্ত্র। সমাজসেবার পাশাপাশি এঁরা স্থান দেন সারস্বত সাধনাকে। এই ক্লাবের সদস্যরা দু বছর ধরে মেতে থাকেন দ্বি-বার্ষিক আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনের প্রস্তুতিতে। সেই সম্মিলিত উদ্যোগ যে কতটা আন্তরিক, কতটা বড় মাপের হতে পারে সেটা দিনহাটা না গেলে জানা হত না।

২০১৭ সালের বিচারে সাহিত্য ক্ষেত্রে অবদানের জন্য পুরস্কার পেলেন তৃপ্তি সান্ত্রা। ২০১৮ সালের জন্য হিতেন নাগ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হল আমাকে। দেওয়া হল মহার্ঘ কাশ্মীরি শাল, মানপত্র, পুষ্পস্তবক, সুবিশাল ট্রোফি এবং আশাতীত অংকের চেক। প্রথম প্রেম, প্রথম সন্তানসুখের মত মানুষ তার জীবনের প্রথম কোনও কিছু কখনও ভোলে না। অ্যামনেশিয়া, ডিমেনশিয়া বা অ্যালঝাইমার্স হলে কী হবে বলতে পারি না, তা না হলে আমার মেমারি ব্যাংকে এই বিশেষ দিনটার সুখস্মৃতির কথা স্টোর হয়ে থেকে যাবে আজীবন।

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য, ২৯মার্চ ২০১৯

এই সংখ্যা থেকে চালু হল ফেসবুক সেরা পোস্ট। 'এখন ডুয়ার্স' বন্ধু তালিকায় যাঁরা আছেন তাঁদের বাছাই পোস্ট থাকবে প্রত্যেক সংখ্যায়।

ভোটে কোন ভবিষ্যৎ চায় ডুয়ার্সের তরুণ ?

নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে এই বছর প্রায় ২০ লক্ষ নতুন ভোটার প্রথমবার ভোট দেবে, ২০১৪ লোকসভা নির্বাচনের চেয়ে এই বছর দেশে প্রায় ৮.৪ কোটি নতুন ভোটার ভোট দিতে চলেছেন, যা সংসদ নির্বাচনের ফল নির্ধারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। 'এখন ডুয়ার্স'-এর পক্ষ থেকে কিছু প্রশ্ন নিয়ে হাজির হয়েছিলাম এই প্রথমবারের ভোটারদের কাছে। প্রশ্ন ছিল, কাকে ভোট দেবে ? কেন দেবে ? কেমন সাংসদ প্রত্যাশা কর ? এলাকার উন্নয়নে কোন কোন বিষয়কে গুরুত্ব দিতে চাও ? শহর কেন্দ্রিক এই শিক্ষিত তরুণ তরুণীদের বেশিরভাগই কলেজের গণ্ডী পেরোয় নি ! এই ডুয়ার্স বঙ্গের আগামীদিনের নাগরিক ভাবনাকে ছুঁতে চেষ্টা করেছেন 'এখন ডুয়ার্স'-এর বিশেষ প্রতিবেদক গৌতম চক্রবর্তী।

জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে শুরু করেছিলাম এবারের সমীক্ষা। কী ভাবছে আগামী লোকসভা নিয়ে ভাবী ইঞ্জিনিয়ারেরা ? দেশের আগামী কর্মসংস্থান, শিক্ষাদীক্ষার হাল হকিকত, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্বরূপ, রাজনীতির গতিপথ বিষয়ে এক খোলামেলা আড্ডায় লিপ্ত হলাম বিভিন্ন ফ্যাকাল্টির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। উঠে এল বিভিন্ন মতামত। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর সাঙ্গে লামা জলপাইগুড়ির ছেলে। সাঙ্গের মতে, এবার

নূরজাহান

শ্রেয়সী

প্রিয়াঙ্কা

প্রথম ভোট দেব বলে অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি। দেশের মঙ্গলের জন্য গৃহীত একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে আমার মতামত নেওয়া হচ্ছে এটাই আমার কাছে অনেক বড় ব্যাপার। অবশ্যই একজন কর্মঠ, উচ্ছল এবং দায়িত্বশীল প্রার্থী খুঁজব আমার মূল্যবান ভোট-এর প্রাপক হিসাবে। শহরের উন্নয়ন নিয়ে সাঙ্গে আশাবাদী।

কম্পিউটার সায়েন্সের তৃতীয় বছরের ছাত্র শুভদীপ কর্মসংস্থান নিয়ে কার্যত দুশ্চিন্তাগ্রস্থ। রাজনীতির কূটকাচালিতে বিরক্ত হলেও ভোটদান তার কাছে গণতান্ত্রিক অধিকার। কিন্তু বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রথম ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে গিয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা তার স্মৃতিপটে অমলিন। তার সোজাসাপ্টা উক্তি, কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন দ্বারা পরিচালিত এই লোকসভা ভোটে আমি স্বচ্ছভাবে আমার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারব এবং ওই সমস্ত তথাকথিত গণতন্ত্রপ্রেমী ভোট লুঠেরাদের, যারা মানুষকে ভোট দেওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে তাদের মুখোশ খুলে দিতে পারব এই আশা রাখি। ভোটের ফলাফল কী হবে জানি না, কিন্তু আমার ভোটটা আমি দিতে পারব এটাই আমার বিরাট আনন্দ।

জলপাইগুড়ি এসি কলেজের রসায়ন বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র সুদীপ্তও একই মত পোষণ করে। তার মতে, উন্নয়ন হচ্ছে এতে সংশয় নেই। কিন্তু খাপছাড়া। সমস্ত কিছু একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনার আওতায় নেই। বিশৃংখলার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলছে উন্নয়ন। তাই পুরনো নিয়ম ভেঙে বর্তমান প্রার্থীরা যেন একটু নতুনভাবে ভাবনাচিন্তা শুরু করেন এবং তারা যেন শুধুমাত্র ভোট চাইতে মানুষের দ্বারে দ্বারে না যান। এক্ষেত্রে তাঁদের প্রতি আমার চাহিদা তারা বা তিনি প্রথমে এলাকাভিত্তিক সমস্যাগুলোকে খুঁজে নিয়ে তালিকাভুক্ত করুন। অন্তত প্রতি দুই মাস অন্তর এলাকাবাসীর কাছে যান এবং কতটুকু কাজ হল বা নতুন কোনো দাবিদাওয়া সংযোজিত হল কিনা সেই ব্যাপারে সবাইকে অবহিত করুন। প্রকৃতপক্ষে একজন ভোটার হিসাবে বিশেষ করে একজন প্রথম ভোটার হিসাবে এই বিষয়টাই আমি বেশি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছি।

একই মত অংকের ছাত্রী সুদীপ্তার, বললেন, জানি যদিও সম্ভব নয় তবুও দলীয় প্রভাব থেকে বের হয়ে কিছুটা হলেও একজন সাংসদের যেন শহর বা তার সংসদীয় ক্ষেত্রের উন্নয়নের ভাবনায় একটা নিখুঁত পরিকল্পনা থাকে। কারণ তিনি তাঁর সাংসদ কোটার অর্থের যদি ঠিকঠাক ব্যবহার করতে পারেন তাহলে অনেকটাই উন্নয়ন হবে পাঁচ বছরে তার নিজের মাধ্যমে। জমি দালালদের দাপটে জলাভূমি, পাহাড়, নদী এমনকি অরণ্য পর্যন্ত হস্তান্তরিত হয়ে যাচ্ছে এবং যার ফলে পরিবেশ হচ্ছে প্রচন্ডভাবে দূষিত। এসব থেকে আমাদের মুক্তি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি যিনি দেবেন তাকেও এগিয়ে রাখব।

বাংলা প্রথম বর্ষের ছাত্রী সন্ধ্যা পালের মতে, একটি সুষ্ঠু, সুন্দর এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন প্রয়োজন। নির্বাচন নিরপেক্ষ হলেই নির্বাচিত সরকারকে নিয়ে কোনও

সংশয় থাকে না। তার মতে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অবশ্যই সুসম্পর্ক থাকা উচিত। কারণ দেশের উন্নয়নের ধারা বজায় রাখার জন্য দলগুলোর মধ্যে সম্প্রীতি থাকাটা খুবই জরুরি। সম্পর্ক ভাল না হলে সৃষ্টি হয় রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা যার ফল ভোগ করে সাধারণ নাগরিক। যেহেতু কৃষি আমাদের দেশের অর্থনৈতিক স্তম্ভ তাই একজন কৃষিবান্ধব সাংসদ চাই যিনি কৃষির সর্বাধিক উন্নয়নে পরিকল্পিতভাবে কাজ করবেন।

রাজগঞ্জ সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী শ্রেয়সী একজন নতুন ভোটার হিসেবে আশা রাখে, তার দেওয়া প্রথম ভোটাধিকার ব্যর্থ হবে না। তবে কারোর কাছ থেকে কোনপ্রকার উচ্চ আশা রাখতে পারছে না সে। কারণ অতীত থেকে সে দেখে এসেছে ভোট শেষ হয়ে গেলে সবাই তাদের দেওয়া

বহু ছাত্র-ছাত্রী ভোট অথবা রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামায় না আজকাল। এমন অনেকেই আছে যারা ভোট দেওয়ার বয়সে পৌঁছলেও ভোটার পরিচয়পত্র পর্যন্ত বানানোর চেষ্টা করেন নি। তবে এদের সবার বক্তব্য ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটি জায়গায় এক, এদেশের নেগেটিভ ভোটিং ব্যবস্থাই তাদের রাজনীতি তথা নির্বাচন নিয়ে অনীহার অন্যতম মূল কারণ।

শুভম

তনুজিৎ

শুভদীপ

অর্ণব

প্রতিশ্রুতিগুলো ভুলে যায়। শ্রেয়শীর বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে কর্মসংস্থান বা উন্নত শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি আজ আর কোনও আস্থা নেই। তার মতে উত্তরবঙ্গ আজও শিল্পবিহীন। সবচেয়ে বড় শিল্প চা শিল্পের মৃত্যু ঘন্টা বেজেছে। কাজেই বেকারত্ব চরম আকার ধারণ করেছে। শ্রেয়সীর পরিহাস, তারা এমন এক সমাজে বাস করে যেখানে পেনশনভোগীরা আবার চাকরি পায় আর যাদের চাকরি পাওয়া উচিত তারা বেকার থাকে।

শিলিগুড়ি সূর্য সেন কলেজের ছাত্রী নূরজাহান এমন একটা নির্বাচন চায় যেখানে সব ভোটার শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিতে পারবে। তার মতে, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অবশ্যই সুসম্পর্ক থাকা প্রয়োজন এবং তাহলে একটা উন্নত দেশ গড়ার পথে সবাই মিলেই কাজ করতে পারব। সে দেশপ্রেমিক এবং উন্নয়নের চেতনায় বিশ্বাসী সাংসদ চায় যিনি জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারবেন। সমস্ত দল সমান সুযোগ সুবিধা নিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে এবং সব ভোটার যেন নির্ভয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে তাদের ভোট দিতে পারে এমন নির্বাচন সে কামনা করে।

দিল্লি ইউনিভার্সিটির ইতিহাস স্নাতক ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র ইমনকল্যাণের বাড়ি কোচবিহারে। জানাল, পড়াশুনা এবং ফিল্ড ওয়ার্ক এর কাজে ব্যস্ত থাকার ফলে ইচ্ছে থাকলেও হয়ত এবার ভোট দিতে আসতে পারবে না। তার মতে, এয়ারে বাগডোগরা পর্যন্ত ম্যানেজ করা গেলেও বাগডোগরা থেকে কোচবিহার পর্যন্ত যেতে ‘গায়ে জ্বর আসে’। এখনও কোচবিহার বিমান পরিষেবা চালু হল না বলে একরাশ বিরক্তি এবং অসহায়তা ঝরে পড়ল তার গলায়। কোচবিহারের উন্নয়ন নিয়ে কোনও সাংসদ নতুন কিছু করে নি বলেই মত ইমনের। তাই যদিও বা ভোট দিতে আসে তাহলে তার মনের মধ্যে প্রবলতর দ্বিধা রয়েছে যে কাকে ভোট দেবে সে এবং কেনই বা দেবে। ইমন এর মতে, যেহেতু কোচবিহারে কোন বৃহদায়তন শিল্প নেই তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই কৃষিভিত্তিক শিল্পের প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এক্ষেত্রেও ইমন কোনও সম্ভাবনার জায়গাই দেখতে পাচ্ছে না। কোচবিহারে কর্মসংস্থানের অভাব প্রকট। কর্মসংস্থানমুখী পরিকল্পনার সম্ভাবনাও তার চোখে ধরা পড়েনি। তাই ভোটদানের আগ্রহ থাকলেও অন্তর থেকে সে দ্বিধাগ্রস্তই।

দেরাদুনে এগ্রিকালচার নিয়ে পড়াশোনা করে জলপাইগুড়ির তনুজিত, প্রথম ভোট দেবার ব্যাপারে উত্তেজিত, নিজেকে কেমন যেন অনেক বেশি দায়িত্ববান বলে মনে হচ্ছে। বিশেষ করে বিভিন্ন প্রার্থীরা যখন ভোট চেয়ে অনুরোধ জানাচ্ছে তখন নিজেকে মনে হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ কেউ। ভোটাধিকার প্রয়োগের এই সুযোগটা তাই মোটেও হালকাভাবে নিচ্ছি না। চিন্তা ভাবনা করে আমি আমার নিজের মতামতটা জানাতে চাই। যিনি তরুণদের গুরুত্ব দেবেন এবং তরুণদের ইচ্ছাগুলোকে বাস্তবে রূপায়িত করার কথা দেবেন অথবা যার মধ্যে আমাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের সঠিক যোগ্যতা থাকবে তাকেই বেছে নেব। যেমন জলপাইগুড়ির সবচেয়ে বড়

সমস্যা হচ্ছে জলবদ্ধতা সমস্যা। তাই নির্বাচনী ইশতেহার অথবা প্রতিশ্রুতিতে এই সমস্যা সমাধানের বাস্তব দিকটি তুলে ধরবেন যিনি তার প্রতি দুর্বলতাটা বেশি থাকবে। আর চিহ্নিত দুর্নীতিবাজকে অথবা সেই দলকে প্রত্যাখ্যান করব স্বাভাবিকভাবেই।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে জিওলজিক্যাল সায়েন্স ছাত্র অঙ্গীকারও কোচবিহারের। জানাল, উন্নয়ন পরিকল্পনা শুধুমাত্র ব্যক্তিবিশেষের উপর নির্ভর করে না। কোন দলের সংসদ নির্বাচিত হলেন সেটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। হয়ত সাংসদের ইচ্ছে থাকলেও তিনি যে দলের সেই দলকে রাজনৈতিকভাবে বঞ্চনা এবং বৈষম্যের শিকার হতে হয়, এমনও অনেকক্ষেত্রে

যদিও সম্ভব নয় তবুও দলীয় প্রভাব থেকে বের হয়ে কিছুটা হলেও একজন সাংসদের যেন শহর বা তার সংসদীয় ক্ষেত্রের উন্নয়নের ভাবনায় একটা নিখুঁত পরিকল্পনা থাকে। কারণ তিনি তাঁর সাংসদ কোটার অর্থের যদি ঠিকঠাক ব্যবহার করতে পারেন তাহলে অনেকটাই উন্নয়ন হবে পাঁচ বছরে তার নিজের মাধ্যমে। জমি দালালদের দাপটে জলাভূমি, পাহাড়, নদী এমনকি অরণ্য পর্যন্ত হস্তান্তরিত হয়ে যাচ্ছে এবং যার ফলে পরিবেশ হচ্ছে প্রচন্ডভাবে দূষিত। এসব থেকে আমাদের মুক্তি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি যিনি দেবেন তাকেও এগিয়ে রাখব।

দেখা যায়। কৃতী এই ছাত্রের দৃষ্টিভঙ্গীতে কোচবিহারে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলেও সেই কলেজে উচ্চ পর্যায়ের ক্যাম্পাসিং না হবার ফলে ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রতি সেই অর্থে আগ্রহ তৈরি হচ্ছে না স্থানীয় স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের। একেই কোচবিহারের শিল্প এবং কৃষি অর্থনীতির অবস্থা সংকটজনক। তাই কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে শিক্ষিত বেকারদের যেটুকু সুযোগ আছে সেটুকু সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে প্রাইমারি স্কুল অথবা মাধ্যমিক স্কুলের ক্ষেত্রে শিক্ষক নিয়োগ একান্তই জরুরি। অঙ্গীকার এর মতে, সাংসদ এবং বিধায়করা যেহেতু একটা নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে প্রতিনিধিত্ব করে তাই তারা যদি ব্যবহারে নমনীয় না হন এবং ভদ্র, সভ্য এবং শিক্ষিত না হন তাহলে তাদেরকে নির্বাচিত করার কোনও মানেই হয় না। যেহেতু শিক্ষার সঙ্গে সামাজিক উন্নয়ন জড়িত তাই সাংসদদের ক্ষেত্রে নূন্যতম শিক্ষাগত যোগ্যতা বেঁধে দেওয়া প্রয়োজন বলে অঙ্গীকার মনে করে। তবুও সবকিছুর মাঝখানে পথ খুঁজে নিতে বিশ্বাসী অঙ্গীকার দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রথমবারের জন্য অংশগ্রহণ করার প্রশ্নে উত্তেজিত এবং আনন্দিত।

অঙ্গীকার

ইমনকল্যাণ

শৌনক

তন্ময়

নিত্যানন্দ

অনন্য

সাংস্কৃতিক কর্মী তির্যু অধিকারীর মতে, রাজনীতিতে প্রতিযোগিতা থাকবেই। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার সূচনা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাজনীতিবিদদের কথা শুনলে মনে হয় একদল অন্য দলের খারাপ দিকগুলো তুলে ধরার জন্য সব সময় আগ্রহ নিয়ে থাকে। তবে তরুণ রাজনীতিবিদদের মধ্যে এই প্রবণতা অনেক কম। পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া ক্ষমতাসীন দল এককভাবে কখনোই দেশের উন্নয়ন করতে পারবে না। তাই পারস্পরিক সম্মান বজায় রেখে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে প্রত্যাশিত। হলদিবাড়ি কলেজের ইতিহাসের ছাত্র নিত্যানন্দ দাস প্রথমবার ভোট প্রদান করতে পারবে কিনা এখনও সংশয়ে ভুগছে। নিত্যানন্দ দাস এর মতে, গণতান্ত্রিক দেশে সবকটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে সুসম্পর্ক থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে যারা ক্ষমতায় যাবে তারা যদি নিজেদের সমর্থকদের নিয়েই ভাবে এবং অন্য দলের কর্মী-সমর্থকদের মতামতকে গুরুত্ব না দেয় তাহলে সরকার সব মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে পারবে না। নিত্যানন্দ এমন একজন সাংসদ চান যেখানে কৃষক, শ্রমিক, মজুর, ব্যবসায়ী সবার স্বার্থ রক্ষা হবে। শিক্ষিত সাংসদের বিকল্প নেই। নিত্যানন্দের কথায়, সাংসদ যদি ব্যবসায়ী হয় অথবা ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি সম্পন্ন হয় তাহলে তার চিন্তা-ভাবনা থাকবে কীভাবে নিজেদের সম্পদকে বাড়ানো যাবে। এই ধরনের সাংসদ নিত্যানন্দ প্রত্যাশা করেন না।

তবে অনেকে অনেক কথা বললেও মোটের ওপর নবীন ভোটারেরা সমাজ, সময় এবং চলতি রাজনীতি নিয়ে খুব একটা আগ্রহী এমন কথা বলা যাচ্ছে না। যেমন সৃজিতা এবার প্রথম ভোট দেবে, পরিষ্কার জানাল, কেন্দ্রে বিজেপি এবং রাজ্যে তৃণমূল কারোর ভূমিকাতেই সে খুশি নয়। তাই সে নোটায় ভোট দেবার কথা ভাবছে। আবার স্মৃতির কথাতে স্পষ্ট গোমাতা সংরক্ষণের পেছনে যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি সেটা তার সরল চোখে ধরা পড়েনি। নইলে সে বলত, গরুকে যেমন আলাদা করে দেখভাল করার ব্যবস্থা করা হয়েছে, তেমনি অন্য

অঞ্জলি, জুলি, জয়ন্তী

জীবজন্তুর জন্যও এটা করা উচিত। কুকুর, বেড়াল এদেরকেও যত্ন নেওয়া উচিত। সে গোমাতা সেবার ব্যাপারটা সামগ্রিকভাবে পশুপাখির যত্ন হিসেবেই দেখছে। একইভাবে রাজনীতির আলোচনা থেকে অনেকটাই দূরে থাকতে চান জলপাইগুড়ি শহরের বাসিন্দা রাহুল। সে মোটামুটিভাবে রাজনীতির খবর রাখে, বন্ধুদের সঙ্গে মতবিনিময় করে ঠিকই, তবে একমাস পরে নিজের ভোটটা কাকে বা কোন দলকে দেবে সেটা এখনও ঠিক করে উঠতে পারে নি। তেমনি বাবা মারা যাবার পর পারিবারিক ব্যবসায় বসতে বাধ্য হয়েছে অনন্য। সোজাসুজি জানাল, এসব ব্যাপারে সে মাথা ঘামানোর সময়ই পায় না। কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পাঠরতা প্রিয়াঙ্কার নির্বাচন বা রাজনীতি নিয়ে কোনও আগ্রহ বা মাথাব্যথা নেই, পড়াশুনা বাদ দিয়ে বা শেষ না করে সে সব নিয়ে ভাবতেও নারাজ সে। তার মতে, মানুষের সেবা করবার সুযোগ রাজনীতিবিদের চাইতে ডাক্তারদের অনেক বেশি মেলে, তাই ডাক্তারি বিদ্যাটা ভাল করে রপ্ত করাটা বেশি যুক্তিসঙ্গত। ভোট নিয়ে স্বভাবতই তার ইন্টারেস্ট এ মুহূর্তে বিন্দুমাত্র নেই।

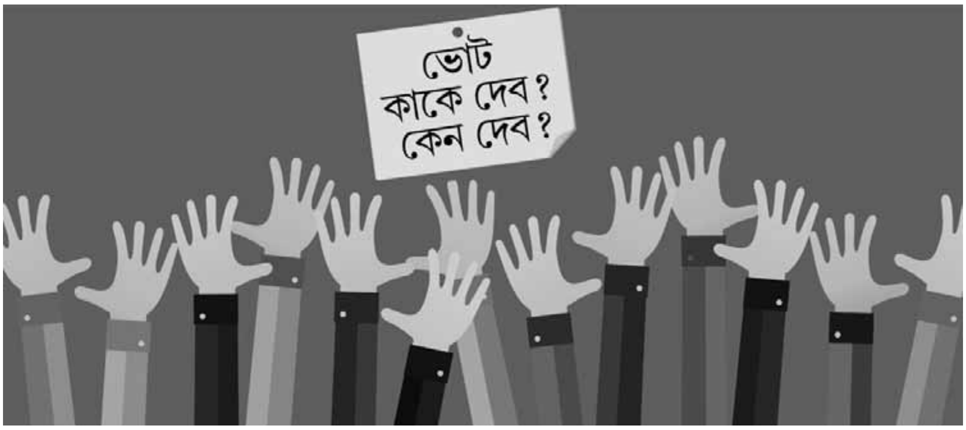

এই ক'দিনে জনা পঞ্চাশ ছেলেমেয়ের কাছে গিয়েছিলাম। পত্রিকায় নাম ছাপানো হবে বলে, অথবা অন্য অজুহাতে পাশ কাটিয়ে গেছে অনেকে। অনেকে অপ্রাসঙ্গিক উত্তর দিয়েছে। অনেকেই রাজনৈতিক চর্বিতচর্বণ করেছে, শাসকদলের গুনগান গেয়েছে অথবা বিজেপির সম্ভাব্য বঙ্গবিজয় সম্পর্কে ভবিষ্যবাণী করেছে, কিন্তু আগামী পাঁচ বছরে তার ভবিষ্যৎ কী হবে তার সদুত্তর দিতে পারেনি। সদ্য উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়া বা সম্প্রতি কলেজে ভর্তি হওয়া অথবা বৃত্তিমূলক পড়াশোনার প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত থাকা বহু ছাত্র-ছাত্রী ভোট অথবা রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামায় না আজকাল। এমন অনেকেই আছে যারা ভোট দেওয়ার বয়সে পৌঁছলেও ভোটার পরিচয়পত্র পর্যন্ত বানানোর চেষ্টা করেন নি। তবে এদের সবার বক্তব্য ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটি জায়গায় এক, এদেশের নেগেটিভ ভোটিং ব্যবস্থাই তাদের রাজনীতি তথা নির্বাচন নিয়ে অনীহার অন্যতম মূল কারণ। "আমরা একে চাইছি না বলে তাকে ভোট দিচ্ছি অথচ সেও যে ভাল সে কথা তো বলা যায় না! কম খারাপ এবং বেশি খারাপের মধ্যে বাছাই করতে বললে কার ভাল্লাগে বলেন?"

এই ক'দিনে জনা পঞ্চাশ ছেলেমেয়ের কাছে গিয়েছিলাম। পত্রিকায় নাম ছাপানো হবে বলে, অথবা অন্য অজুহাতে পাশ কাটিয়ে গেছে অনেকে। অনেকে অপ্রাসঙ্গিক উত্তর দিয়েছে। অনেকেই রাজনৈতিক চর্বিতচর্বণ করেছে, শাসকদলের গুনগান গেয়েছে অথবা বিজেপির সম্ভাব্য বঙ্গবিজয় সম্পর্কে ভবিষ্যবাণী করেছে, কিন্তু আগামী পাঁচ বছরে তার ভবিষ্যৎ কী হবে তার সদুত্তর দিতে পারেনি। সদ্য উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়া বা সম্প্রতি কলেজে ভর্তি হওয়া অথবা বৃত্তিমূলক পড়াশোনার প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত থাকা বহু ছাত্র-ছাত্রী ভোট অথবা রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামায় না আজকাল। এমন অনেকেই আছে যারা ভোট দেওয়ার বয়সে পৌঁছলেও ভোটার পরিচয়পত্র পর্যন্ত বানানোর চেষ্টা করেন নি।

তবে ভোট ভাল না লাগলেও কর্মসংস্থানের দুশ্চিন্তা কমবেশি রয়েছে সবার মাথায়। বেসরকারি ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠানের ছাত্র চঞ্চলের অভিমতই হতে পারে এই সমীক্ষার উপসংহার। "বহির্বিশ্বের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে মাথা উঁচু করে নিজেদের স্থান করে নেবে এক সমৃদ্ধশালী ভারত, এই প্রজন্মের মুখ্য চাওয়া সেটাই হবে স্বাভাবিক। কিন্তু সেই সঙ্গে যদি নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনও স্বচ্ছ ধারণা তৈরি না হয় তাহলে এই নির্বাচন নিয়ে তাদের ইন্টারেস্ট কেন থাকবে বলবেন? আমরা সবাই জানি, কলেজ পাশ করে আজ হোক বা কাল নামতেই হবে রোজগারের পথে। যারা মেধাবী ও সচ্ছল পরিবারের ছেলে, কিংবা যাদের মেধা না থাকলেও অর্থের অভাব নেই তাদের কথা আলাদা। কিন্তু বাকি শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের কথা ভাববেন একবার। যাদের চাকরি পেতে গেলে নেতাদের টাকা দেওয়ার সাধ্য নেই! তাদের রোজগারের সেই পথ যদি দিনকে দিন কঠিন ও সাধ্যাতীত ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে ওঠে, বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয় তবে এসব ভোটের মানেটা কী?"

একটা ভোটে কি আদৌ সুরক্ষিত হতে পারে সেই তরুণের ভবিষ্যৎ?

সরকার বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আশ্চর্য ভাটা চলছে। ফলে আজকের নতুন প্রজন্ম তার ভবিষ্যৎ চাওয়া পাওয়া নিয়ে অন্ধকারে দিশাহীন।

রাজনীতির পাচন

বোফর্স বনাম রাফেল

রাফেল এক নজিরবিহীন দুর্নীতি!

দেবপ্রসাদ রায়

সম্প্রতি কংগ্রেস নেতা সলমন খুরশিদ বলেছিলেন, “রাফেলই মোদী সরকারের ‘অ্যাকিলিস হিল’-এ পরিণত হবে।” (গ্রিক দেবতা রাজা মায়ারডিনের পুত্র অ্যাকিলিস জন্মানোর পর দৈববাণী হয় যে, ও অতি অল্প বয়সেই প্রাণ হারাবে। তার মা থেটিস তাকে এক আশ্চর্য ক্ষমতাসম্পন্ন নদীর ধারে নিয়ে যায়, যে নদীর জলে কেউ একবার ডুব দিলে সে অজেয়, অবধ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু শিশুটিকে জলে ডোবানোর সময় গোড়ালি দুটি ধরে মা জলে ডুবিয়েছিলেন বলে— সে কালক্রমে অজেয় হয়ে উঠলেও তাঁর গোড়ালি দুর্বলতম অংশ হয়ে থাকায় দেবতা অ্যাপোলোর নির্দেশে প্যারিস তাঁর গোড়ালি লক্ষ্য করে বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা করে)। ২০শে জুলাই সংসদে রাহুল গান্ধীর তীর মোদীর গোড়ালিতে আঘাত করাতে তিনি যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে বারবার ‘জাতীয় নিরাপত্তার’ দোহাই দিচ্ছিলেন।

কখনও নির্মলা সীতারমনকে, কখনও মোদীকে প্রশ্ন করছিলেন রাহুল গান্ধী। দাবি— সংসদে রাফেলের (যুদ্ধ-উড়োজাহাজ) প্রকৃত দাম দেশকে জানাতে হবে। যদিও কিছুদিন আগে নির্মলার পাশে অরুণ জেটলি দাঁড়িয়ে বলেছেন, ‘প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের দাম প্রকাশ্যে জানানো প্রথা বিরুদ্ধ। কংগ্রেস অতীতের তিনটি উদাহরণ দিয়ে তৎক্ষণাৎ এই যুক্তির অসারতা প্রমাণ করেছে।

কিন্তু অভিযোগটা কী? রাফেল নিয়ে যে বির্তক, তার শেকড় খুঁজতে গেলে যেতে হবে ২০০৭ সালে।

২০০৭ সালে প্রথম ইউপিএ সরকার ১২৬টি মাল্টিরোল কমপ্যাক্ট বিমান কেনার জন্য আন্তর্জাতিক

দ্বিগুণ দামে রাফেল কেনা হচ্ছে, সেটাই শুধু অভিযোগের প্রতিপাদ্য নয়, হ্যাল-এর মতো অ্যাভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রিতে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সংস্থা, যারা এ ব্যাপারে শুধু চুক্তি স্বাক্ষর করেনি, ডসল্ট-এর প্রশিক্ষণ নিয়ে ১০৮টি রাফাল নিজেদের কারখানায় তৈরি করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, তাঁরাও এখন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছে। কারণ ৩৫,০০০ কর্মচারী নিয়ে যে সংস্থা তার কাছে ২০২০ সালের পর আর কোনও অর্ডার না থাকার ফলে তারপর তাঁদের জন্য কোন ভবিষ্যত অপেক্ষা করছে তা'ই নিয়ে সবাই শঙ্কিত।

- **২০০৭ সালে প্রথম ইউপিএ সরকার ১২৬টি মাল্টিরোল কমপ্যাক্ট বিমান কেনার জন্য আন্তর্জাতিক স্তরে দরপত্র আহ্বান করে।**
- **ফরাসি সংস্থা ডসল্ট অ্যাভিয়েশন সর্বনিম্ন দর দিয়েছিল।**
- **২০১২ সালে তার সঙ্গে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়।**
- **১২৬টি বিমানের মধ্যে ১৮টি বিমান সরাসরি সরবরাহ এবং বাকি সবগুলি যুদ্ধবিমান হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড (হ্যাল)-এর ব্যাঙ্গালুরুস্থিত কারখানায় নির্মিত হবে— এই শর্তে ডসল্ট 'টেকনোলজি ট্রান্সফার করতে রাজি হয়ে যায়।**
- **ডসল্ট-এর সাথে ২০১৪ সালের মার্চ মাসে হ্যালের এই মর্মে চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়ে যায়।**

স্তরে দরপত্র আহ্বান করে। যে পাঁচটি বিদেশি সংস্থা দরপত্র দিয়েছিল, তার ভেতর বাছাই পর্বে ফরাসি সংস্থা ডসল্ট অ্যাভিয়েশন সর্বনিম্ন দর (৫৪,০০০ কোটি) দিয়েছিল বলে পাঁচ বছর পর ২০১২ সালে তার সঙ্গে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। ১২৬টি বিমানের মধ্যে ১৮টি বিমান সরাসরি সরবরাহ করবে বলে স্থির হয়। এবং বাকি সবগুলি যুদ্ধবিমান ভারত সরকারের অধীনস্থ হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড (হ্যাল)-এর ব্যাঙ্গালুরুস্থিত কারখানায় নির্মিত হবে— এই শর্তে ডসল্ট 'টেকনোলজি ট্রান্সফার করতে রাজি হয়ে যায়। ডসল্ট-এর সাথে ২০১৪ সালের মার্চ মাসে হ্যালের এই মর্মে চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়ে যায়।

২০১৪ সালে তদানীন্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী অরুণ জেটলি সংসদে জানান যে, এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। ২০১৫ সালের মার্চ মাসে অনিল আম্বানি তার নতুন অ্যাভিয়েশন নির্মাণ সংস্থা পঞ্জীকৃত করে।

এপ্রিল মাসে নরেন্দ্র মোদি ফ্রান্সে যান এবং সেখান থেকেই ঘোষণা করেন ১২৬টি নয়, ৩৬টি রাফ্যেল যুদ্ধবিমান ডসল্ট-এর কাছ থেকে কেনা হবে। এই সফরে তার সঙ্গে প্রতিরক্ষামন্ত্রী না থাকলেও অনিল আম্বানি ছিলেন। ইতিমধ্যে প্রতিরক্ষামন্ত্রী ঘোষণা করে জানিয়ে দিয়েছেন যে ডসল্টের সঙ্গে ভারত সরকারের ২০১২ সালের ১২৬টি রাফাল বিমান কেনার চুক্তি বাতিল হয়ে গেছে। এখন কেবল ৩৬টি বিমান কেনা হবে।

প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ক্রয় করবার বিষয়ে ভারত সরকারের যে ঘোষিত নীতি আছে, তার প্রথম পরিচ্ছেদের ৪.১ ধারায় পরিষ্কার বলা আছে 'প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম নির্মাণে অভিজ্ঞ কোনও সংস্থাই কেবলমাত্র এক্ষেত্রে যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। 'হ্যালের সে' অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও তাকে বাদ দিয়ে অনিল আম্বানির ভুঁইফোর সংস্থাকে ভারতীয় অংশীদারিত্ব দিয়ে কোন নিরাপত্তা রক্ষিত করা হয়েছে— রাহুল গান্ধী বারবার তাঁর ৪৫ মিনিটের ভাষণে সেটাই জানতে চেয়েছিলেন। প্রাক্তন সেনা ও পরবর্তীতে আইএএস পদে আসীন দেবশ্যাম বলেছেন, 'এই চুক্তির ভেতর দিয়ে ভারতে প্রতিরক্ষার মত স্পর্শকাতর বিষয়েও আর কোনও গোপনীয়তা রাখবার অবকাশ থাকবে না, এবং অনিল আম্বানির হাত ধরে এবার প্রতিরক্ষার সরঞ্জাম নির্মাণেও বিদেশি পুঁজি তার জায়গা করে নেবে।'

বিরোধীরা প্রশ্ন তুলেছে যে যেখানে ৫৪,০০০ কোটি টাকায় ১২৬টি বিমান কেনা হচ্ছিল সেখানে ৩৬টি বিমান ৫৮,০০০ কোটি টাকায় কেনা হচ্ছে কেন? যা '১২ সালে এক হাজার কোটি টাকার বেশি দাম দিয়ে ভারত সরকার কিনছে! যদিও নির্মলা সীতারমন সংসদে রাফালের প্রতিটি মূল্য জানাতে অস্বীকার করেছেন। তার যুক্তি প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের দাম এভাবে প্রকাশ্যে জানানো হয় না। এ যে মিথ্যাচার তা' আগেই জানিয়েছি। একদিকে দেউলিয়া অনিল আম্বানিকে (যার অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ ১ লক্ষ ১০ হাজার কোটি টাকা) সরকারি আনুকুল্যে বাঁচিয়ে তোলা হচ্ছে (যদিও প্রতিরক্ষামন্ত্রী সংসদকে জানিয়েছেন, ভারত সরকার ডসল্টের ভারতীয় সহযোগী সম্পর্কে কিছু জানে না, '১৫ সালের মার্চ মাসে 'রিলায়েন্স অ্যাভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রি'র যেদিন ভিত্তি স্থাপন হয়, তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন নীতিন গড়করি ও দেবেন্দ্র ফড়নবীশ)। দ্বিগুণ দামে রাফ্যেল কেনা হচ্ছে, সেটাই শুধু অভিযোগের প্রতিপাদ্য নয়, হ্যাল-এর মতো অ্যাভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রিতে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সংস্থা, যারা এ ব্যাপারে শুধু চুক্তি স্বাক্ষর করেনি, ডসল্ট-এর প্রশিক্ষণ নিয়ে ১০৮টি রাফাল নিজেদের কারখানায় তৈরি করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, তাঁরাও এখন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছে। কারণ ৩৫,০০০ কর্মচারী নিয়ে যে সংস্থা তার কাছে ২০২০ সালের পর আর কোনও অর্ডার না থাকার ফলে তারপর তাঁদের জন্য কোন ভবিষ্যত অপেক্ষা করছে তা'ই নিয়ে সবাই শঙ্কিত।

প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ শ্রী অজয় শুক্লা জানিয়েছেন, 'যেভাবে অনভিজ্ঞ, অখ্যাত সংস্থা রিলায়েন্স এয়ারোস্পেসকে বিপুল পরিমাণ খয়রাতি সাহায্য পাইয়ে দেওয়া হল— তা এক নজিরবিহীন দুর্নীতি। নিদেনপক্ষে টাটা অ্যাভিয়েশন, এলএনটি বা মাহিন্দ্রা— যাদের কিছুটা হলেও বিমান নির্মাণের অভিজ্ঞতা আছে, তারা কেউ হলেও একটা যুক্তি খুঁজে পাওয়া যেত। কিন্তু এক্ষেত্রে শুধু এইটুকুই বলা যেতে পারে যে সংস্থার মালিক প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ।' বিশিষ্ট আইনজীবি ও স্বরাজ ইন্ডিয়ার মুখপত্র শ্রী প্রশান্ত ভূষণ বলেছেন, স্বাধীনতার পর প্রতিরক্ষা দপ্তরের এত বড় 'স্ক্যাম' অতীতে কোনওদিন সামনে আসেনি। সমস্ত আইনি প্রক্রিয়াকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তিনি (মোদী) এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন। কেন মাত্র ৩৬টি? কেন ১২৬ নয়? যা 'প্রাথমিক স্তরে নির্ধারিত হয়েছিল? এ শুধু একটি পরিবারকে সুবিধে পাইয়ে দেয়ার জন্যই একটি নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত!'

তাই কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী সংসদে বলেছেন '১৯ সালে দেশের মানুষ নিশ্চয়ই এর ব্যাখ্যা চাইবে।

(কৃতজ্ঞতা স্বীকার— ন্যাশনাল হেরাল্ড)

রাফ্যেল বফর্সের মত মারণাস্ত্র হয়ে উঠল না কেন?

জয়ন্ত গুহ

রাফ্যেল গান্ধি... সরি, রাহুল গান্ধির রাফ্যেল ডিম... সরি আগেইন, ডিম নয় ডিল। রাহুল গান্ধির 'দুর্নীতির অভিযোগে দুষ্ট রাফ্যেল ডিল'— সরকার পক্ষকে বেশ কিছু ঢিল-পাটকেল মারলেও, রাজনৈতিক বোমা হয়ে উঠতে পারল না। এবং নির্বাচন যত কাছে এগিয়ে এল তার তেজ যেন নিস্প্রভ হয়ে গেল। রাহুল গান্ধি নিঃসন্দেহে চেয়েছিলেন, রাফ্যেল দুর্নীতিকে লোকসভার ইস্যু করে, বিজেপি নয়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ইমেজে আঘাত হানা। কঠিন খেলা তবে তিনি টুকটুক করে রানও পাচ্ছিলেন, প্রতিদিন তখন মিডিয়ার মনযোগ পাচ্ছেন। এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ দিচ্ছেন। রীতিমত সুপারস্টার। জীবন তখন যেন হিন্দি ছবির গুলগপ্পো। সিলভার স্ক্রিনের নায়কের মত তিনি সংসদের ভিতর কখনও প্রধানমন্ত্রীকে জড়িয়ে ধরছেন, তারপর সংসদ চলাকালীন নিজের আসনে বসে কাউকে চোখ মারছেন। আবার কখনও আমজনতার সভায় হাতা গুটিয়ে মোদিকে রাফ্যেল হুলে বিদ্ধ করছেন। অথচ বেচারা আমজনতা ও কংগ্রেস কর্মীরা পরিস্কার করে জানেই না, 'রাফ্যেল' গায়ে দেয় না মাথায় মাখে! সবাই ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে রইল রাহুলের দিকে, ডাকসাইটে কং নেতাদের দিকে, তাঁদের ভাষাই যে মাথায় ঢুকল না! যেমন এক কংগ্রেস নেতা সলমন খুরশিদ বললেন, "রাফ্যেলই মোদি সরকারের অ্যাকিলিস হিল"! বোঝো কাণ্ড! 'অ্যাকিলিস হিল' (Achilles heel) এই ইউরোপীয় বাকধারার বাংলায় সহজ অর্থ হল, কারও একটি ছোট দুর্বল জায়গা তার বিশাল ক্ষতির কারণ হতে পারে! কিন্তু সাধারণ কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকদের 'অ্যাকিলিস হিল'-এর তত্ত্ব দিলে তো অম্বল হবেই, চুয়া ঢেঁকুরও উঠতে পারে। তাঁদের প্রশ্ন একটাই, রাফ্যেল নিয়ে এত হইচই হল, সংসদের বাইরে খোদ সনিয়া গান্ধি প্রতিবাদে সরব হলেন কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতাদের নিয়ে, মিডিয়া এত সাপোর্ট দিল কিন্তু তারপর 'দ্য হিন্দু'-র এডিটর-ইন-চিফ, এন রাম ছাড়া রাহুলের পাশে কেউ এসে দাঁড়াল না। কেন? প্রথম দিকে রাহুলের সঙ্গে গলা মেলালেও বিরোধীদলের নেতা-নেত্রীরাও চুপ। কেন?

রাফ্যেল কি মোদির বোফর্স?

একসময় আম আদমি পার্টির নেতা যোগেন্দ্র যাদব এবং প্রশান্ত ভূষণ আপ পার্টি থেকে বেরিয়ে এসে তৈরি

করেন দুর্নীতি বিরোধী সংগঠন স্বরাজ অভিযান এবং সংযুক্ত রাজনৈতিক শাখা স্বরাজ ইন্ডিয়া। যোগেন্দ্র যাদবের কথায় "রাফ্যেল,সম্ভবত বফর্সের থেকেও বড় দুর্নীতি। সন্দেহের আঙুল উঠছে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর দিকে। এবং রাফ্যেল নিয়ে দুর্নীতির প্রমাণ আছে, এখনও পর্যন্ত তা সাবস্টেনসিয়াল এভিডেন্স, যদিও প্রমাণিত নয়"। সত্যিই যদি রাফ্যেল নিয়ে 'সাবস্টেনসিয়াল এভিডেন্স' থাকে তাহলে তা লোকসভা নির্বাচনের প্রধান ইস্যু হল না কেন? ভারতবর্ষে দুর্নীতি তো রকেট গতিতে ইস্যু হয়। যোগেন্দ্র যাদবের কথায়, "অ্যামপ্লিফিকেশনের অভাব। সাধারণ মানুষের মধ্যে যথেষ্ট প্রচার প্রসার না পাওয়ায় রাফ্যেল ইস্যু হয়ে উঠতে পারল না এবং এর জন্য দায়ী মিডিয়ার 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' মনোভাব। দ্বিতীয়ত ভিপি সিং-এর মত বিশ্বাসযোগ্য বিকল্প নেতার অভাবে, বফর্সের থেকে বড় দুর্নীতি হওয়া সত্ত্বেও রাফ্যেল ইস্যু হয়ে উঠতে পারল না"।

— সুপ্রিম কোর্টের রায়, রাফ্যেল নিয়ে কংগ্রেসের তির কংগ্রেসের দিকেই ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য বিজেপিকে সুবিধা করে দিয়েছে। যদিও সুপ্রিম কোর্টের রায়ে উল্লেখ করা হয়েছে 'ফ্যাকচুয়াল এররস' বা তথ্যগত ত্রুটির, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি 'নন এক্সিস্টেন্ট ক্যাগ বা সিএজি রিপোর্ট'। প্রায় তিরিশ বছর আগে বফর্স দুর্নীতিতে রাহুলের বাবা রাজীব গান্ধীকে বিদ্ধ করে ক্ষমতায় এসেছিলেন রাজীব মন্ত্রিসভার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ভিপি সিং। তিরিশ বছর পর একই কায়দায় মোদিকে বিপাকে ফেলতে চাইছেন, রাজীব পুত্র রাহুল। কিন্তু চেষ্টা করেও ফল মিলছে না। কেন? —মোদির তীব্র সমালোচক এবং দাপুটে সাংবাদিক রাজদীপ সরদেশাই এবং ইন্ডিয়া টুডে-র মতে, ইস্যু হয়ে ওঠার জন্য রাফ্যেল বিতর্ক এবং বফর্স দুর্নীতির মধ্যে বিস্তর ফারাক আছে। প্রথমত, বফর্সের ক্ষেত্রে সুইডেনের প্রাক্তন পুলিশকর্তা স্টান লিনডস্ট্রম ছিলেন 'হুইশেল ব্লোয়ার'। বফর্স-ইন্ডিয়া হাউইটজার চুক্তি নিয়ে তদন্তকারী দলের প্রধান

রাফ্যেল নিয়ে এখনও কোনও 'মানি ট্রেইল' প্রমাণিত হয়নি। অভিযোগ উঠেছে, রিলায়েন্স ডিফেন্স এবং আনিল আম্বানিকে অসঙ্গত সুবিধে পাইয়ে দেওয়ার।

দ্বিতীয়ত, বফর্সের ক্ষেত্রে ক্যাগ বা সিএজি রিপোর্টে দুর্নীতির অভিযোগকে সমর্থন দেওয়া হয়েছিল। রাফ্যেল-এর ক্ষেত্রে কোনও সরকারি রিপোর্ট এখনও প্রতিরক্ষা চুক্তি নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি।

তৃতীয়ত, বফর্সের ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে বিরোধীদল টার্গেট করেছিল রাজীব গান্ধিকে। রাফ্যেলের ক্ষেত্রে কংগ্রেস বাধ্য হচ্ছে একা লড়াই চালিয়ে যেতে। এবং রাফ্যেল নিয়ে কংগ্রেসকে একমাত্র যারা সমর্থন দিচ্ছে সেই বামেদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী জোট বাঁধতে পারেনি কংগ্রেস। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে, রাফ্যেল নিয়ে কংগ্রেস কি আদৌ পলিটিক্যালি সিরিয়াস? নাকি রাফ্যেল, রাহুলের কাছে নিছকই পারিবারিক ইস্যু?

চতুর্থত, রাজীব গান্ধির তুলনায় বিজেপি রাফ্যেল

বফর্স দুর্নীতিতে শেষ পর্যন্ত ক্লিন চিট পেলেও নির্বাচনের ময়দানে হেরে গিয়েছিলেন রাজীব গান্ধি। তিরিশ বছর পর রাজীব তনয় রাহুল সংগঠনের সর্বোচ্চ দায়িত্ব পেয়েও এবং মিডিয়ার সহযোগিতা সত্ত্বেও রাফ্যেল দুর্নীতি নিয়ে নরেন্দ্র মোদির জন্য কতটা মারণাস্ত্রক হয়ে উঠতে পেরেছেন তা নিয়ে সংশয় রয়েছে কংগ্রেসেই।

যোগেন্দ্র যাদব বিজেপি এবং মোদিবিরোধী সমালোচকদের মধ্যে অন্যতম মুখ এ নিয়ে সন্দেহ থাকতে পারে না। "কিষাণ মুক্তি মার্চ"-এর সংসদ অভিযানে যোগেন্দ্র ছিলেন মিছিলের সামনের সারিতে। সেই যোগেন্দ্র যাদবও রাফ্যেল নিয়ে বলতে গিয়ে বফর্স যে দুর্নীতি ছিল, তা অস্বীকার করেন নি। এবার দেখা যাক, যোগেন্দ্রর অভিযোগ অনুযায়ী, ভারতীয় মিডিয়া কেন রাফ্যেল নিয়ে কোমর বেঁধে মাঠে নামল না।

রাফ্যেল নিয়ে মিডিয়ার অবস্থান

রাফ্যেল নিয়ে বিজেপি-কংগ্রেসের পারস্পরিক 'পারসেপশন যুদ্ধে', মিডিয়ার একাংশ গোটা বিষয়টিকে এতটাই গুলিয়ে ফেলেছেন যে তাঁরা রাফ্যেল নিয়ে ঘটনা পরম্পরা এবং নাটকীয় মুহূর্ত বাদ দিয়ে বিষয়কেন্দ্রিক বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। মিডিয়ার আর একটি অংশ সরাসরি সরকারি লেজুড়বৃত্তি করছে। আর যে অংশটি প্রায় প্রতিদিন ক্রমাগত রাফ্যেল নিয়ে সরকার পক্ষকে সমালোচনার পাশাপাশি কংগ্রেসের দুর্বলতার জায়গাগুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন— তাঁদের মধ্যে অন্যতম মুখ রাজদীপ সরদেশাই এবং ইন্ডিয়া টুডে গ্রুপ। রাফ্যেল নিয়ে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে রাজদীপ তাঁর অনুষ্ঠানে খুব পরিষ্কার ভাবে বলছেন

বফর্সের ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে বিরোধীদল টার্গেট করেছিল রাজীব গান্ধিকে। রাফ্যেলের ক্ষেত্রে কংগ্রেস বাধ্য হচ্ছে একা লড়াই চালিয়ে যেতে। এবং রাফ্যেল নিয়ে কংগ্রেসকে একমাত্র যারা সমর্থন দিচ্ছে সেই বামেদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী জোট বাঁধতে পারেনি কংগ্রেস। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে, রাফ্যেল নিয়ে কংগ্রেস কি আদৌ পলিটিক্যালি সিরিয়াস? নাকি রাফ্যেল, রাহুলের কাছে নিছকই পারিবারিক ইস্যু?

লিনডস্ট্রম-এর দেওয়া তথ্য ফাঁস করে দিয়েছিল সুইডিশ মিডিয়া। সুইডেনে ভারতীয় সাংবাদিক চিত্রা সুব্রামনিয়ামকে দেওয়া লিনডস্ট্রম-এর সাক্ষাতকারে ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিত হয় বফর্স নিয়ে মধ্যস্থতাকারীদের মধ্যে অজস্র মানি ট্রেইল বা টাকার লেনদেন। কিন্তু

বিতর্ককে পরিচালনা করেছে অনেক সুসংহত উপায়ে। বফর্স বিতর্কে রাজীব গান্ধির মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছিলেন তাঁরই মন্ত্রিসভার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ভিপি সিং। যদিও প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর ভিপি সিং, সেই বফর্স নিয়ে আর বেশি আগ্রহ দেখান নি। আসলে দেশের স্বার্থে নয়, নিজের এবং ক্ষমতার নতুন অলিন্দ তৈরির স্বার্থেই তিনি বফর্স দুর্নীতিকে ব্যবহার করে নতুন রাজনৈতিক জোট তৈরি করেছিলেন।

রাফ্যেল নিয়ে একঘরে রাহুল

লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশজুড়ে বিরোধীদের কাছে রাফ্যেল হয়ে উঠতেই পারত মোদিবিরোধী বিষাক্ত অস্ত্র। দুর্নীতি প্রমাণিত না হলেও, দুর্নীতির আঁশটে গন্ধও কাজে দিতে পারত। কিন্তু নির্বাচন পরবর্তী মোদি বিরোধী মহাগঠবন্ধনে সবাই একত্রিত হতে পারেন বলে কথা দিলেও রাফ্যেল বিতর্কে রাহুলের পাশে কেউ নেই। আঞ্চলিক মোদি বিরোধী নেতা-নেত্রীরা সম্ভবত রাফ্যেল নিয়ে সংসদ এবং সংসদের বাইরে রাহুলের যুক্তিতর্ক এবং কংগ্রেসের বিচারবুদ্ধিতে ভরসা পাচ্ছেন না। কিংবা আঞ্চলিক নেতা-নেত্রীরা নিজভূমে অস্তিত্ব বাঁচাতে মোদির রাজনৈতিক বিস্তার রুখতে চাইলেও, কোণঠাসা এবং পরিবারকেন্দ্রিক কংগ্রেসকে আবারও দেশের ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনতে নারাজ।

রাজনীতির পাচন

পুবের ভারতে কংগ্রেস কই?

সৌমেন নাগ

নির্বাচনের কুরুক্ষেত্রের শঙ্খধ্বনির ডাক দেওয়া হয়েছে। শুরু হয়েছে রণক্ষেত্রের রণকৌশল ও শক্তি সমাবেশের শেষ প্রস্তুতি। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য, শল্য, কর্ণ, দুর্যোধন, যুধিষ্ঠির, অর্জুন, ভীমদের মতন মহারথীরা তাদের তূণে অস্ত্র সাজাতে ব্যস্ত। কে কৃষ্ণ যেমন এই নির্বাচনী রণক্ষেত্রে চেনা মুশকিল তেমনই কোন পক্ষ পান্ডব আর কোন পক্ষ কৌরব সেটাও তেমনই যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে বলা মুশকিল। কারণ এখানে যে পক্ষ বিজয়ী হবে সেই হয় পান্ডব। ধর্ম যে তার পক্ষে সেই ঘোষণা করে সে করে। তাই এই যুগের নির্বাচনী কুরুক্ষেত্রের সংগ্রামভূমিতে 'যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানি র্ভবতি ভারত, অভ্যুত্থানম ধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম'— এই ধ্বনিতে রণভূমিতে কেউ আর্বিভূত হন না। হবেনই বা কীভাবে? কোনটা ধর্ম আর কোনটা অধর্ম সেটাই রাজনৈতিক ভাওয়ের বাজারে শেয়ার মার্কেটের মতন সতত পরিবর্তনের দোলায় দুলে চলে। তাই মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে ইচ্ছামৃত্যুর অধিকারী মহাজ্ঞানী মহাভারতের ভীষ্মের মতন এখানে কেউ তার অন্তিমকালের সময়ে বলতে পারেন না 'যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ'— ধর্ম যেখানে জয় সেখানে। গান্ধারীও বলেছিলেন একই কথা। কারণ এরা ধার্মিক ছিলেন বলেই কোনটা ধর্ম আর কোনটা অধর্ম তা জানতেন। তাই এটাও জানতেন ধর্মেরই হয় জয়।

১৭তম লোকসভা গঠনের নির্বাচনের সময় ক্ষমতার আসনে বিজেপি। বিরোধী দলগুলি হতে চাইছে জোটবদ্ধ। বার বার করে সেই জোটে জড়ো হচ্ছে নানা জট। বিরোধী দলগুলি বিজেপি-কে ক্ষমতা থেকে হটাবার জন্য এই জোটের কথা বলছেন। কিন্তু বিজেপি-কে ক্ষমতাচ্যুত করার পর তারা শূন্যস্থান কীভাবে পূরণ করবেন তার কোনও স্পষ্ট রূপ তারা দেশের ভোটদাতাদের কাছে উপস্থিত করতে পারছেন না। প্রকৃতিতে যেমন কোনও শূন্যস্থান থাকে না, কোনও কিছু সেই শূন্যস্থান পূরণ করে দেয় তেমনই রাজনৈতিক ক্ষমতার মসনদও শূন্য থাকে না। একের অপসারণে সেই শূন্যস্থান পূরণে আরেক রাজনৈতিক শক্তি এগিয়ে আসে। এখানে বিরোধী দলগুলি সেই প্রশ্নের কোনও গ্রহণযোগ্য উত্তর দিতে গিয়ে প্রচণ্ডভাবে হোঁচট খাচ্ছেন। ফলে জোটের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে যতই অনিশ্চিয়তা দেখা যাচ্ছে ততই বিরোধী দলগুলি পারস্পরিক বিশ্বাসযোগ্যতার ক্ষেত্রে একে অপরের প্রতি সন্দেহের দোলায় দুলতে শুরু করেছেন।

এখানেই একটা প্রশ্নের উত্তর খোঁজার দায় উপস্থিত হয়। ভারতের প্রাচীনতম ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্যবাহী জাতীয় কংগ্রেসের বর্তমান অবস্থান ও তার ভূমিকা। ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস লোকসভায় ৩৬৪টি আসনে নির্বাচিত হয়ে দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল হিসাবে তাদের ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে নিজেদের উপস্থিত করেছিল। তাদের প্রাপ্ত ভোটের হার ছিল ৪৫ শতাংশ। আজকের শাসক তথা সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনসঙ্ঘের নামে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পেয়েছিল ৩টি আসন। ভোটপ্রাপ্তির হার ছিল ৩.১ শতাংশ। প্রশ্নটা যে এখানেই। শতাব্দী প্রাচীন ভারতের জাতীয় কংগ্রেস আজ ক্ষয়িষ্ণু হতে হতে তার একক ক্ষমতাকে হারিয়ে এই দেশের কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গে জোটবদ্ধ হবার চেষ্টায় তাদের অস্তিত্ব রক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা এমন দাঁড়িয়েছে এই আঞ্চলিক দলগুলি যেন অনেকটা কৃপাপরবেশ হয়েই কংগ্রেসকে কয়েকটি আসন ছেড়ে দিয়ে তাকে জোটে নিয়ে কংগ্রেসকেই ধন্য হতে বলেছে।

রাজনৈতিক শক্তি ও তার বিন্যাসে সর্বভারতীয় জাতীয় দল বলতে তো বিজেপি ও কংগ্রেসকেই ধরা যায়। ফলে জাতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেস বিরোধিতার ক্ষেত্রে যেমন বিজেপিকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয় তেমনই বিজেপি বিরোধিতার মঞ্চে কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে ভাবার কোনও জায়গা থাকার কথা নয়। আর একই কারণে অন্য প্রায় সব রাজনৈতিক দলগুলি কোনও না কোনও সময়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিজেপি অথবা কংগ্রেসের সঙ্গে যৌথ কর্মসূচী এমন কী সরকার গঠনে প্রত্যক্ষ বা বাইরে থেকে সমর্থন জানিয়েছে। কংগ্রেস ও বিজেপি দল কিন্তু কোনও সময়ে কোনওভাবেই একে অপরের হাত ধরে নি। তা সম্ভব ছিল না। কারণ বিজেপি জানত বা জানে কংগ্রেসের বিকল্প সরকার গড়তে সর্বভারতীয় দল হিসাবে সে-ই একমাত্র সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল, তার সেই অবস্থানকে ধরে রাখতে হবে। বিপরীতে কংগ্রেসও জানে বা জানত বিজেপি সরকার ব্যর্থ হলে তারাই একমাত্র সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল যারা সেই জায়গা দখল করতে পারে।

যুদ্ধে জেতা কিন্তু শুধু সেনাবাহিনীর সংখ্যার ওপর নির্ভরশীল নয়। এর জন্য দরকার যুদ্ধের সঠিক নেতৃত্ব ও রণকৌশল এবং সেনাবাহিনীর জেতার অদম্য মনোবল। তাই দেখা যায় ইব্রাহিম লোদীকে তার লক্ষাধিক সৈন্য

নিয়ে এসেও বাবরের দশ হাজার সেনাদলের কাছে পরাজয় বরণ করতে। কংগ্রেস রাজনৈতিক রণক্ষেত্র থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে সেটা যারা ভাবছে তারা ভুল করছে। সাম্প্রতিক বিধানসভার নির্বাচনে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ এবং ছত্তিশগড়-এ কংগ্রেসের জয় কিন্তু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এতে প্রমাণ হয় কংগ্রেস যদি নিজেকে বিজেপি'র বিকল্প শক্তি হিসাবে নিজেদের উপস্থিত করতে পারে তবে যে সমস্ত ভোটদাতারা বিজেপি-কে পছন্দ করে না তারা কিন্তু আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলির হাতে দেশের রাজনৈতিক ভাগ্যকে সঁপে না দিয়ে কংগ্রেসকেই বেছে নিতে চাইবে।

আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোর একটা ভাল লক্ষণ হচ্ছে ভোটাররা ধীরে ধীরে তাদের ভাবনার মস্তিষ্কে শান দিতে পারছে। তাই এখন সেই আগের মতন গোষ্ঠীর নেতার অঙ্গুলি হেলনে সবাই একবাক্যে সায় দিচ্ছে না। এমন কি মহিলা ভোটারদের একটি অংশ পতিব্রতা স্ত্রীর আনুগত্যের প্রমাণ রাখতে স্বামীর নির্দেশে ভোটপ্রার্থীর পক্ষে ছাপ দিতে যে চাইছে না তা বিগত নির্বাচনগুলিতে দেখা গেছে। মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলি থেকে তুলনামূলকভাবে সামান্য হলেও বিজেপি-র পক্ষে যে কিছু ভোট পড়ছে তাতে বোঝা যায় ধর্মীয় ভিত্তিতে মৌলবীতন্ত্রের মুষ্টিও কিছুটা আলগা হতে শুরু হয়েছে।

২০১৪ সালের নির্বাচনে বিজেপির পক্ষে যে জনসমর্থনের জোরাল স্রোত বইছিল তাতে কিন্তু একটি ভাটার টান স্পষ্ট হয়ে দেখা দিচ্ছিল (অন্তত পক্ষে বালাকোটে ভারতের বিমান আক্রমণের আগে পর্যন্ত)। তবু কংগ্রেস সর্বভারতীয় রাজনৈতিক মঞ্চে নিজেকে সম্ভাব্য বিকল্প শক্তি হিসাবে নিজেকে উপস্থিত করার মানসিক শক্তিকে সংহত করতে এক আশ্চর্যরকম কাপুরুষতার আতঙ্কে ভুগতে শুরু করেছিল। এখানেই যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতির দায়িত্ব তার সেনাবাহিনীর মানসিক শক্তিকে উজ্জীবিত করে রণক্ষেত্রে বিজয়ী মানসিকতাকে ফিরিয়ে আনা। মানুষ কিন্তু সাহসী নেতৃত্ব চায়। ভীরু বা দ্বিধাগ্রস্থ নেতৃত্বের প্রতি তারা আস্থা স্থাপন করতে রাজি নয়।

আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোর একটা ভাল লক্ষণ হচ্ছে ভোটাররা ধীরে ধীরে তাদের ভাবনার মস্তিষ্কে শান দিতে পারছে। তাই এখন সেই আগের মতন গোষ্ঠীর নেতার অঙ্গুলি হেলনে সবাই একবাক্যে সায় দিচ্ছে না। এমন কি মহিলা ভোটারদের একটি অংশ পতিব্রতা স্ত্রীর আনুগত্যের প্রমাণ রাখতে স্বামীর নির্দেশে ভোটপ্রার্থীর পক্ষে ছাপ দিতে যে চাইছে না তা বিগত নির্বাচনগুলিতে দেখা গেছে।

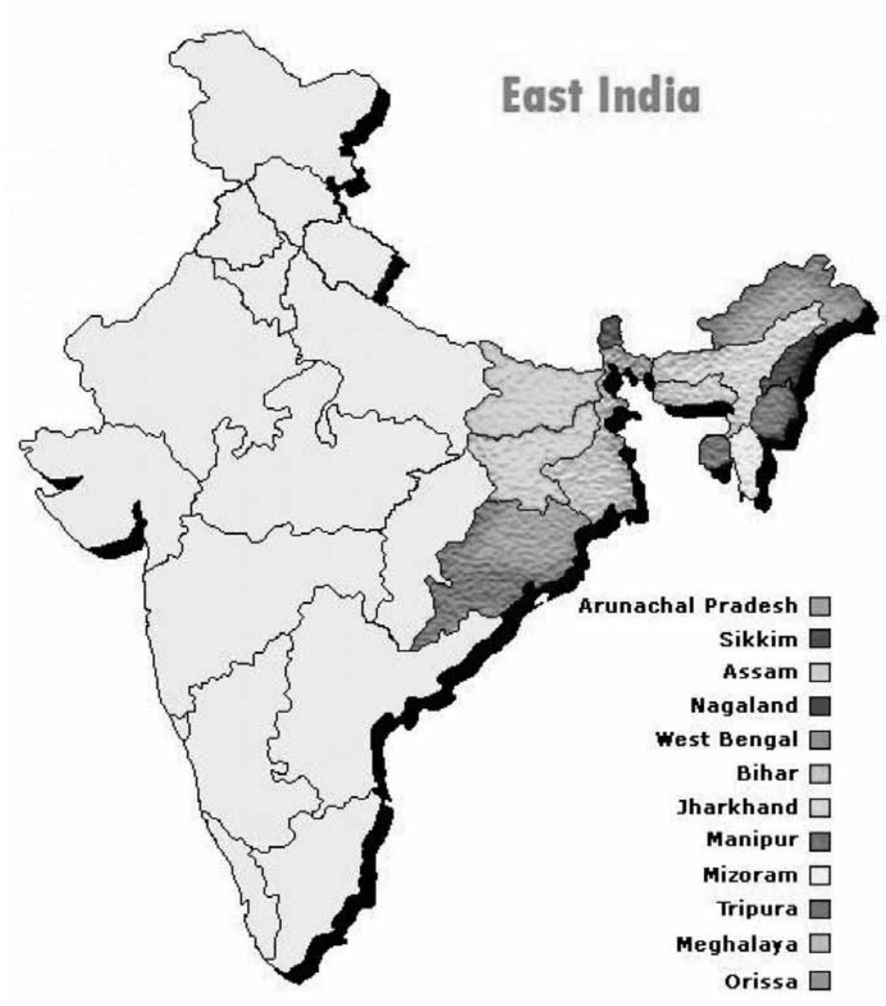

কংগ্রেস নেতৃত্বের ব্যর্থতা এখানেই। তাদের মানসিকতায় এককালের 'করব অথবা মরব'— সেই দৃপ্ত ভাবনার কোনও ছাপ এখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই তাদের কেন্দ্র করে অন্য আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলি আবর্তিত হয় না। কংগ্রেসই আঞ্চলিক দলগুলির কাছে কৃপাপ্রার্থীর মতন আসন সমঝোতার জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকছে। প্রশ্নটা যে আসন ভাগাভাগির নয়, প্রশ্নটা যে এক ঐক্যমতের কর্মসূচীর ভিত্তিতে জোটবন্ধন সে কথাটুকুও বলতে পারছে না। ফলে ভোটারদের মনে প্রশ্ন অমীমাংসিত থেকে যাচ্ছে— আসন ভাগাভাগি করে নির্বাচন হওয়ার পর সরকার যে একটা ঐক্যমতের কর্মসূচীর ওপর গঠিত হবে সেই ঐক্যমতের কর্মসূচীর ঘোষণাপত্র কোথায়? ভোটদাতারা তো ভোট দেবে ভাবী সরকারের কর্মসূচী দেখে। নির্বাচনের পর সর্বনিম্ন ঐক্যমতের কর্মসূচী প্রস্তুত করে তারা সরকার গঠন করবেন বলার অর্থ যে ঘোড়া কেনার আগেই ঘোড়ার লাগাম দেখিয়ে ঘোড়ার ছায়াতে চড়ে বসার পরামর্শ দেওয়া। ভোটদাতারা সেই অনিশ্চয়তার পথের যাত্রী হতে কতখানি রাজি সেখানেই যে গভীর অনিশ্চয়তা থেকে যায়।

এক সময় বলা হয় এই ভারতের এমন কোনও জায়গা খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে অন্ততপক্ষে কংগ্রেসের পতাকা ধরার লোক নেই। একই কথা বলা হত পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি সম্পর্কে। বিহার থেকে ঝাড়খন্ড হয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রাজ্যগুলি পর্যন্ত যদি একটি রেখা টানা যায় তবে এমন একটি রাজ্য এই রেখায় জায়গা পাবে না যেখানে একটি কংগ্রেস শাসিত রাজ্য আছে। আগামী নির্বাচনগুলিতেও কংগ্রেস তাদের উপস্থিতিকে হাজির করতে পারবে এমন কোনও সম্ভাবনার কথা কংগ্রেস মহলেও শোনা যাচ্ছে না। ভাবার প্রয়োজন আছে শতাব্দীরও বেশি প্রাচীন এই রাজনৈতিক দলটির এমন অবস্থা কেন হল?

ভারতবর্ষের মতন বিশাল দেশের এই নানা ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির মানুষের সংহতিকে এক জাতীয় ঐক্যের বাঁধনে ধরে রাখার জন্য প্রয়োজন সর্বভারতীয় শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের। বিজেপি সর্ববৃহৎ দল হলেও ভারতের সর্বত্র তার শক্তি বা সংগঠনকে এখনও প্রসারিত করতে পারেনি। দক্ষিণ ভারতে একমাত্র কর্ণাটক ছাড়া অন্য রাজ্যগুলির নিয়ন্ত্রক সেখানকার আঞ্চলিক দল। এক সময় কংগ্রেসই ছিল সেই অর্থে যথার্ত সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল। ১৯৫৬ সন থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত অন্ধ্রপ্রদেশে একটানা কংগ্রেস বিজয়ী হয়ে এসেছিল। সঞ্জীব রেড্ডি, ব্রহ্মানন্দ রেড্ডি, নরসীমা রাও, ভেঙ্গালা রাও, চেন্না রেড্ডি, টি আনজাইয়া, ভেঙ্কটরামি রেড্ডি, ভাস্করা রেড্ডির মতন কংগ্রেসী নেতারা একের পর এক এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রিত্বের দায়িত্ব সামলেছেন। আজ সেই অন্ধ্রপ্রদেশে কংগ্রেসের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে।

১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত তামিলনাডুও ছিল কংগ্রেস শাসিত রাজ্য। টি প্রকাশন, রামস্বামী রেড্ডিয়ার, কুমারস্বামী রাজা, সি রাজাগোপালচারী, কে কামরাজ ও এম ভক্তভৎসলম-এর মতন কংগ্রেসীরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রিত্বের দায়িত্ব সামলেছেন। ১৯৬৭ সাল থেকে এই রাজ্যে কংগ্রেস উপগ্রহের মতন আঞ্চলিক দলের কক্ষপথে আবর্তিত হয়ে চলেছে।

পূর্ব ভারতেও তো ছিল কংগ্রেসের একচ্ছত্র আধিপত্য। ১৯৭২, ১৯৭৮, ১৯৮৫ এই কয়েকটি

নির্বাচন ছাড়া আসামে কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রিত্ব সামলে এসেছিল কংগ্রেস। আজকে সেই রাজ্য থেকে কংগ্রেস উৎপাটিত। এই রাজ্যেই তো ছিলেন গোপীনাথ বরদলই, বিষ্ণুরাম মেধী, বিমলাপ্রসাদ চালিহা, এম এম চৌধুরী, সৈয়দ আনোয়ার তৈমুর, কে সি গগৈ, হিতেশ্বর শইকিয়ার মতন কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী।

পূর্ব ভারতের বিহার ছিল কংগ্রেসের এক শক্তিশালী দুর্গ। স্বাধীন ভারতের প্রথম নির্বাচন থেকে শুরু করে ১৯৬৭, ১৯৬৮, ১৯৭০, ১৯৭৭, ১৯৭৯ সাল বাদ দিয়ে ১৯৮৯ পর্যন্ত একটানা কংগ্রেস এই রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রিত্বের দায়িত্ব পালন করেছিল। কৃষ্ণ সিন্‌হা, কৃষ্ণবল্লভ সাহে, ভোলা পাশোয়ান শাস্ত্রী, কেদার পান্ডে, আব্দুল গফুর, জগন্নাথ মিশ্র, চন্দ্রশেখর সিং, বিন্দেশ্বরী দুবে, সত্যেন্দ্রনাথ ঝা-দের মতন কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রীকে পেয়েছিল এই রাজ্য। আজ সেই রাজ্যে দুর্নীতির দায়ে শাস্তি প্রাপ্ত লালুপ্রসাদ যাদবের আঞ্চলিক দলের সঙ্গে তাদের শর্তে জোট বেঁধে কংগ্রেসকে তার অস্তিত্ব রাখতে হচ্ছে।

পূর্বাঞ্চলের আরেক রাজ্য ওড়িশাতেও কংগ্রেস ছিল শক্তিশালী রাজনৈতিক দল। ১৯৪৬ থেকে ১৯৮৫ একটানা (১৯৬৭ এবং ১৯৭১ এবং ১৯৭৭ ছাড়া) কংগ্রেসই এই রাজ্যের ক্ষমতার অধিকারী ছিল। ডঃ এইচ কে মহাতাব, এন কে চৌধুরী, বি এন পট্টনায়ক, বীরেন মিত্র, সদাশিব ত্রিপাঠী, নন্দিনী সৎপতি, বিনয়াক আচার্যের মতন কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রীরা এই রাজ্যে কংগ্রেসের শাসন ধরে রেখেছিলেন।

আজকের পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেস তো এমন সাইনবোর্ড সর্বস্ব রাজনৈতিক দল ছিল না। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৬২ এই একটানা ছিল কংগ্রেসের রাজত্ব। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭১ পশ্চিমবাংলার শাসনভার হস্তান্তরিত হলেও ১৯৭২ সালে কংগ্রেস আবার ক্ষমতায় এসে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিল। এই রাজ্যে প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ, বিধান চন্দ্র রায়, প্রফুল্ল চন্দ্র সেন, সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের মতন কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রীরা দলের শাসনভারকে ধরে রেখেছিলেন।

পূর্ব ভারতের মণিপুরের মতন ছোট রাজ্যেও ১৯৭২ সন বাদ দিলে ১৯৬৩ সাল থেকে কংগ্রেসই ছিল ক্ষমতার কেন্দ্রে। এম কয়রেণ সিং, এল থাম্বু সিং, ওয়াই শাইজিয়া, আর কে দোরেন্দ্র সিং, রিশং কেইশিং, আর কে জে সিং-এর মতন কংগ্রেসীরা এই রাজ্যের শাসন ক্ষমতা সামলে এসেছেন। সেই মণিপুরেও কংগ্রেসের অস্তিত্ব বিপন্ন।

১৯৭২ সালের ২১শে জানুয়ারি গঠিত হয়েছে পূর্ব ভারতের আরেকটি ছোট রাজ্য, মেঘালয়। সেখানেও কংগ্রেস ছিল শক্তিশালী রাজনৈতিক দল। ওয়াই এ সাংমা ও পি এ সাংমা কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দীর্ঘদিন এই রাজ্যের শাসনভার সামলেছেন। আজ এই রাজ্যটি বলতে গেলে কংগ্রেস শূন্য।

নাগাল্যান্ড গঠিত হয়েছিল ১৯৬৩। উগ্র বিচ্ছিন্নতাবাদী আক্রমণকে মোকাবিলা করেও এই রাজ্যে

এক সময় বলা হয় এই ভারতের এমন কোনও জায়গা খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে অন্ততপক্ষে কংগ্রেসের পতাকা ধরার লোক নেই। একই কথা বলা হত পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি সম্পর্কে। বিহার থেকে ঝাড়খন্ড হয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রাজ্যগুলি পর্যন্ত যদি একটি রেখা টানা যায় তবে এমন একটি রাজ্য এই রেখায় জায়গা পাবে না যেখানে একটি কংগ্রেস শাসিত রাজ্য আছে। আগামী নির্বাচনগুলিতেও কংগ্রেস তাদের উপস্থিতিকে হাজির করতে পারবে এমন কোনও সম্ভাবনার কথা কংগ্রেস মহলেও শোনা যাচ্ছে না।

কংগ্রেস শাসন ক্ষমতা থেকে দূরে ছিল একথা কিন্তু বলা চলে না। এস সি জামির, হোকিশে সেমা-র মতন কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রীরা তো এই রাজ্যে কংগ্রেসের পতাকাকে ধরে রেখেছিলেন। নাগাল্যান্ড আজ কংগ্রেস মুক্ত।

অরুণাচল— এখানেও শুরু হয়েছে রাজনৈতিক কর্মকান্ড। সংগঠনহীন কংগ্রেস এখানে নীরব দর্শক মাত্র।

একটা আশঙ্কা তাই স্বাভাবিকভাবেই উঁকি দিতে শুরু করেছে পূর্ব ভারতে কি কংগ্রেস তার অস্তিত্বকে বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচাতে পারবে? ভাবতে হবে শুধু কংগ্রেসের স্বার্থে নয় এই ভাবনার প্রয়োজন দেশের সংহতিকে ধরে রেখে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বজায় রাখার স্বার্থে। ২০১৪ সালের লোকসভার নির্বাচনে কংগ্রেসের ১৭৯ জন প্রার্থীরই জমানত বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। বিজেপি-রও অবশ্য ৬২ জন প্রার্থী জমানত খুইয়েছিলেন। তবে সেই নির্বাচনে বিজেপি কংগ্রেস-এর থেকে বেশি প্রার্থী দিয়েছিল।

রাফেল দুর্নীতির অভিযোগকে সামনে এনে কংগ্রেসের নবনিযুক্ত সভাপতি রাহুল গান্ধী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চুরির দায়ে অভিযুক্ত করে যে জোরাল জোট গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন তা কিন্তু বাস্তবায়িত হয়নি এবং তার সম্ভাবনাও ছিল না। প্রতিরক্ষার জটিল চুক্তি নিয়ে ‘পাহাড়াদার চোর হ্যায়’— এই শ্লোগানের পেছনে সাধারণ ভোটারদের সমাবেত করা যে সম্ভব নয় সেই বাস্তব অবস্থাটি কংগ্রেসের প্রবীণ নেতারা তাদের নবীন ও রাজনৈতিক প্রাঙ্গণে অনভিজ্ঞ সভাপতিকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন কি না অথবা তোষামোদী ভূমিকা পালন করতে ব্যস্ত নেতারা তা বলতেই সাহস করেন নি তা স্পষ্টভাবে বলা যাচ্ছে না। তবে রাহুল গান্ধী যাদের নিয়ে জোট গড়ার কথা ভেবেছেন সেই সব রাজনৈতিক দলগুলিও যে এই শ্লোগানে সাড়া দিতে চাননি তা স্পষ্ট। তার একটি কারণ তারা কোনও ভাবেই কংগ্রেসের সভাপতির হাতে রাজনৈতিক শ্লোগানের নেতৃত্ব তুলে দিতে চায় না, কারণ সেই সব দলের অনেকেই স্বপ্ন দেখছেন দেবগৌড়ার মতন কর্ণাটকের এক আঞ্চলিক দলের নেতা যদি দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন তবে একই অবস্থার সুযোগ এলে তারাও দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সুযোগ নিতে পারবেন।

আরেকটি ক্ষেত্রে রাজনীতির মঞ্চে অনভিজ্ঞ তরুণ কংগ্রেসী সভাপতি মারাত্মক ভুল করে বসলেন। বালাকোটে পাকিস্তানী সন্ত্রাসীদের উপর হামলায় ভারতীয়দের জাতীয়তাবাদের মানসিকতা যখন প্রচণ্ডভাবে ফুটন্ত অবস্থায় আছে সে সময় ভারতীয় বিমানবাহিনীর পাকিস্তানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার প্রশ্নে মৃতের সংখ্যা নিয়ে বিতর্ক হাজির করে সেই জাতীয়তাবোধকেই আঘাত করে বসলেন। বিজেপি যে এরকম সুযোগের জন্য অপেক্ষা করছিল। উত্তর-পূর্ব ভারতের বিশেষ করে গোর্খাদের এক বিরাট অংশ সামরিক বাহিনীতে নিযুক্ত। বিমান হানা ও তার সাফল্য নিয়ে এভাবে সন্দেহ প্রকাশ তাদের মানসিকতাকে যে আঘাত করতে পারে তা মনে রেখে এ বিষয়ে আরও কৌশলী হওয়ার কথা মনে রাখা হয়নি।

১৭তম লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি কিন্তু তার নড়বড়ে অবস্থাকে অনেকটা মেরামত করতে পেরেছে। এনডিএ-র শরিক দলগুলিকে মোটামুটিভাবে ঐক্যবদ্ধ রেখে উত্তর-পূর্ব ভারতের ছোট ছোট দলের অনেককেই কাছে টেনে আনতে পেরেছে। অপর দিকে কংগ্রেস সে ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। নাগরিকত্ব বিল নিয়ে বিতর্ক ওঠার সঙ্গে একটা ভাল দিকও সামনে হাজির হয়েছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের ছোট রাজ্যগুলির কণ্ঠস্বর জাতীয় ক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়ায় এই রাজ্যগুলি জাতীয় ক্ষেত্রে তাদের উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারছে। যে অরুণাচল এতদিন বলতে গেলে দেশের মূল স্রোতের বাইরে ছিল সেই অরুণাচলও এখন জাতীয় ভাবনার বৃত্তে হাজির হচ্ছে। এটা কিন্তু জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

আগামী লোকসভা নির্বাচনের ফল নিয়ে আগাম ভাবনার কথা বলা যাবে না। এই প্রশ্নে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ স্পষ্ট। কংগ্রেস আবার জাতীয় রাজনীতিতে উপগ্রহের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটিয়ে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠুক সেটাই ভারতের গণতন্ত্রের স্বার্থে কাম্য।

অবশেষে জলপাইগুড়িতে সার্কিট বেঞ্চ

প্রশান্তনাথ চৌধুরী

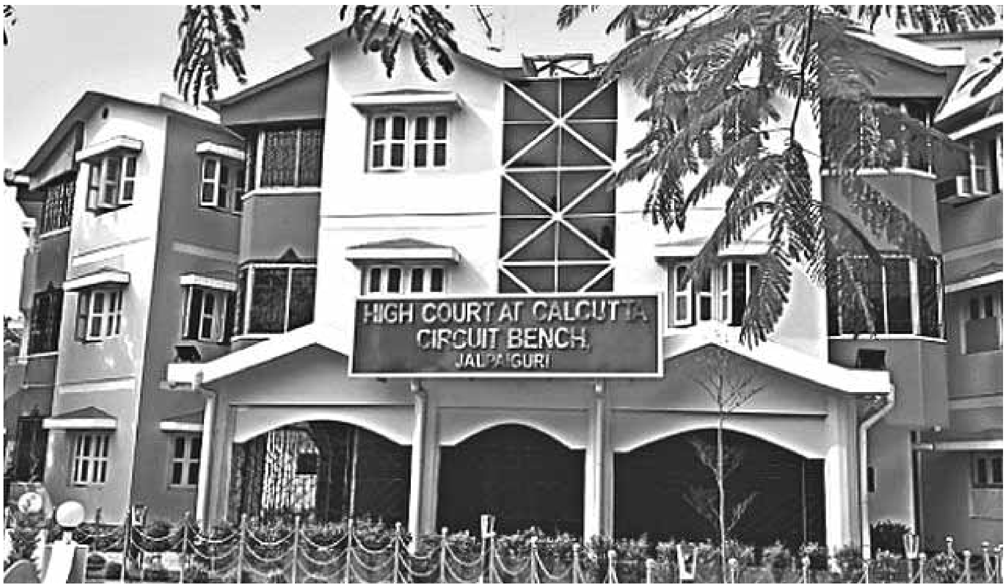

দেড়শ বছরের উদাসী জলপাইগুড়ি। জেলাকে কেটে ছোট ছোট করে দেওয়া হয়ত ভৌগোলিক কারণে একান্ত জরুরি ছিল, কিন্তু সংলগ্ন মহকুমা সংযোজিত হল না— সবাই চুপচাপ। রাজগঞ্জ ব্লকের জন অধ্যুষিত এলাকা প্রায় জেলা থেকে বাইরে, এই শহর একেবারে নিশ্চুপ। জেলা শহরের ৭-৮ কিলোমিটার দূরে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন, বেশিরভাগ দূরপাল্লার ট্রেন এই স্টেশনে দাঁড়ায় না— দু'-চার জন আড্ডায় চিৎকার করে, তারপর মিইয়ে যায়। যুগ অতিক্রান্ত এখানে চা বিক্রির অকশন কেন্দ্র হয়েছিল— তা এখানে কাজ করে না, এই শহরের কোনও উত্তাপ নেই। শহরের মাঝে প্রবাহিত করলা নদী নাগরিক সভ্যতার চাপে, আবর্জনা ও বর্জ্যের ভারে নদী প্রায় বন্ধ্যা নালা। নাগরিককুল চুপ। রাতে দূরপাল্লার সরকারি বাস শহরের বাইরের (বাইপাস) রাস্তা দিয়ে ছুটে যায় অথচ মাত্র কয়েক কিলোমিটার বেশি দৌড়লে শহরের টার্মিনাস ছুঁয়ে যাওয়া যায়— তা হয় না। চা কোম্পানিগুলোর হেড অফিসগুলো ধীরে ধীরে শহর ছেড়ে চলে গেল— জীবনের মধ্য গগনে কত মানুষ জীবিকাচ্যুত হল, কিন্তু এ শহর নির্বিকার।

এই শহরের আপামর বৃদ্ধবনিতা বিগত নব্বই দশকে একযোগে রাজনীতির উর্দ্ধে গর্জন করে উঠেছিল ধাক্কা লেগেছিল কলকাতার মহাকরণে, ঝনঝনানি শোনা গিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে। দাবি ছিল কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ স্থাপন করতে হবে। শহর স্তব্ধ করে বাচ্চা-বুড়ো, স্থানীয় ক্লাব, রাজনৈতিক দলগুলো, ছাত্রছাত্রীরা বিশাল মিছিল বার করে সার্কিট বেঞ্চের দাবিতে। এদিকে একই দাবিতে শিলিগুড়িতেও আন্দোলন শুরু হয়।

শোনা যায় এই দাবি প্রথম উঠেছিল ১৯৬৩ সালে। তবে ১৯৬৯ শালের শুরুতে প্রয়াত নরেশ চক্রবর্তীর বাড়িতে এক বিকেলে কিছু বিশিষ্ট মানুষকে জলপাইগুড়িতে সার্কিট বেঞ্চের ব্যাপারে আলোচনা, আবছা মনে পড়ে।

নব্বই দশকের শুরুতে সেই আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে ১৯৯৩ সালে কলকাতা হাইকোর্টের তিনজন মহামান্য বিচারক পরিকাঠামো ইত্যাদি পরিদর্শনের শহরে আসেন। উত্তেজনায় ও শ্রদ্ধায় সমস্ত শহর রাস্তায় নেমে এসে বিচারপতিদের সম্মান জ্ঞাপন করেছিল। ক্লাব, ব্যবসায়ী সমিতিগুলো এবং বার অ্যাসোসিয়েশন ও নাগরিকবৃন্দের এই যৌথ প্রয়াস সঙ্গে তৎকালীন প্রশাসনের অনবদ্য ভূমিকা বিফলে যায়নি। ১৯৯৪ সালে কলকাতা হাইকোর্ট ঘোষণা করে— জলপাইগুড়িতে কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ স্থাপিত হবে। সেদিন সারা শহর উৎসবে মেতে উঠেছিল— অকাল দেওয়ালি যাপন করেছিল শহর। সার্কিট বেঞ্চ দাবি আদায় সমন্বয়কারী সংগঠনের নেতা কমলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় একান্তে বলেছিলেন 'হয়ত দেরি হবে তবে সার্কিট বেঞ্চ হবেই'।

দিনের পর দিন জলপাইগুড়ি জেলা আদালত বন্ধ করে, আদালতের প্রবেশ পথে ম্যারাপ বেঁধে রাতদিন

ন্যাশনাল হাইওয়ের পাশে শহরের কাছেই পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জমিদারপাড়া অঞ্চলে প্রায় ৪৫ একর জমি নির্দিষ্ট বেঞ্চের জন্য অধিগ্রহণ করা হয়— তাও একযুগ অতিক্রান্ত। ইতিমধ্যে হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতিগণ ও আধিকারিকরা বার কয়েক শহরে এসেছেন। প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। অধিকৃত এলাকা বিপুল ব্যয়ে ঘেরা হয়েছে— তাও কিছু জায়গায় জীর্ণ, কিন্তু অস্থায়ী আদালত চালু হয়নি। এক সময়ের তরুণ নাগরিকরা যারা সেদিনের আন্দোলনে-মিছিলে প্রথম সারিতে ছিলেন তারা আজ প্রৌঢ়। পূর্তদপ্তর নাকি বারংবার সিভিল ওয়ার্কের নক্‌শা বানিয়েছে— তাতে একাধিকবার বদল করা হয়েছে।

অবস্থান বিক্ষোভ চলেছিল। সমস্ত গণসংগঠন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। হাইকোর্ট এই বিক্ষোভ অবৈধ ঘোষণা করেছিল— জেলাশাসক শ্রী রঞ্জিত (আই.এ.এস.), শ্রী ত্রিপুরারী (এস.পি.), শ্রী প্রশান্ত চন্দ (আই.সি.), শ্রী দেবপ্রসাদ রায়, শ্রী মুকুলেশ সান্যাল... ও আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছিল। পরবর্তীতে মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট তাদের জামিন মঞ্জুর করে। আশা করা হয়েছিল জলপাইগুড়ি স্টেশন রোড সংলগ্ন জেলা পরিষদের ডাকবাংলোতে অস্থায়ীভাবে সার্কিট বেঞ্চের কাজ শুরু হবে। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে ডাকবাংলোকে ভেতর-বাইরে আদালতের রূপ দেওয়া হল, বিচারকদের অস্থায়ী আবাস হিসেবে সার্কিট হাউস ও তিস্তা ভবনকে সাজানো হল, বারংবার রাজ্য থেকে পরিদর্শন করা হল। ইঞ্জিনিয়ার ও স্থানীয় প্রশাসন অভাবনীয় তৎপরতা দেখাল— কিন্তু সার্কিট বেঞ্চ চালু হল না। অবশেষে জানা গেল সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী পরিকাঠামোর কাজ শুরু না হলে— অস্থায়ীভাবেও সার্কিট বেঞ্চে চালু করা সম্ভব নয়। ন্যাশনাল হাইওয়ের পাশে শহরের কাছেই পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জমিদারপাড়া অঞ্চলে প্রায় ৪৫ একর জমি নির্দিষ্ট বেঞ্চের জন্য অধিগ্রহণ করা হয়— তাও একযুগ অতিক্রান্ত। ইতিমধ্যে হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতিগণ ও আধিকারিকরা বার কয়েক শহরে এসেছেন। প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। অধিকৃত এলাকা বিপুল ব্যয়ে ঘেরা হয়েছে— তাও কিছু জায়গায় জীর্ণ, কিন্তু অস্থায়ী আদালত চালু হয়নি। এক সময়ের তরুণ নাগরিকরা যারা সেদিনের আন্দোলনে-মিছিলে প্রথম সারিতে ছিলেন তারা আজ প্রৌঢ়। নাগরিকরা হতাশায় নিজেদের মধ্যে আলাপচারিতায় বলে— 'হাইকোর্টের অস্থায়ী বাড়িটা পুনরায় ডাকবাংলোতে রূপান্তরিত হোক।

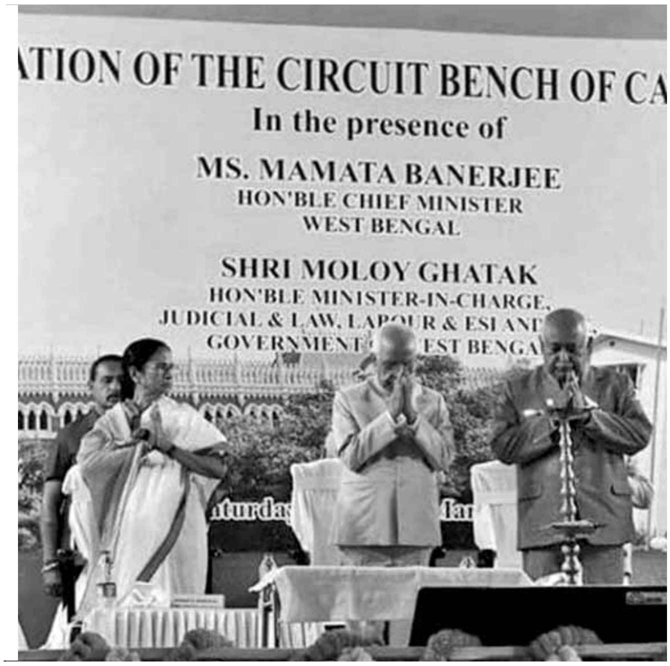

তাহলে শহরের বিয়ে বাড়ি ভাড়ার একটা স্থায়ী পরিকাঠামো হতে পারে। এখন পূর্ত দপ্তর বাড়িটির নিয়মিত পরিচর্যা করে— আর ডিউটিরত পুলিশকর্মীর বিশ্রামের একটা ব্যবস্থা হয়। অত্যন্ত দামী আসবাবপত্র, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ইত্যাদির বর্তমান হাল চেষ্টা করেও দেখতে পারিনি— প্রহরারত কর্মীরা অনুমতি দেয়নি। পূর্তদপ্তর নাকি বারংবার সিভিল ওয়ার্কের নক্‌শা বানিয়েছে— তাতে একাধিকবার বদল করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ২০১৮ সালের প্রায় শুরুতেই খবর পাওয়া গেল— পূর্ত দপ্তরের নক্‌শা অনুমোদিত হয়েছে এবং প্রায় ৩৫২ কোটি টাকার হাইকোর্টের ইমারত তৈরির টেন্ডার প্রক্রিয়া সরকার শুরু করেছে, দু'-তিন মাসে তা সমাপ্ত হবে। এবার কাজ এগবে।

সে এক এলাহি ব্যাপার, প্রায় ৫০০ বর্গ মিটার জায়গা জুড়ে চারতলা বাড়ি তৈরি হবে। থাকবে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কক্ষ, বিশ্রামকক্ষ, সিঙ্গল জাজদের বেশ কয়েকটি বিচারকক্ষ, একাধিক বিচারকের কিছু বিচারকক্ষ, আধিকারিকদের বসার কক্ষ, লাইব্রেরি, ল-ইয়ারদের বসার কক্ষ, ল-ইয়ার্স ক্লার্কদের বসার কক্ষ, প্রচুর টয়লেট এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কক্ষ। তৈরি হবে ১৫ জন বিচারপতির বাংলো এবং প্রধান বিচারপতির জন্য একটি বেশ বড় আকৃতির বাংলো।

আশির দশকের শেষে এবং নব্বই দশকের প্রথম দিকে আন্দোলন চালাচ্ছিলেন শহরের আম নাগরিক এবং জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশন। ২০০৭ শালের ১০ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন জেলা শাসক সার্কিট বেঞ্চের জমি বিচার বিভাগের সচিবকে হস্তান্তর করেছিলেন। তারপর পূর্তবিভাগকে নকশা তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়। নানা কারণে নক্‌শার বেশ কয়েকবার পরিবর্তন করা হয়। মাননীয় বিচারকরা ইতিমধ্যে কয়েকবার এসেছেন সরেজমিনে অবস্থা যাচাই করেছেন। কিন্তু অস্থায়ী কোর্ট চালু করা সম্ভব হয়নি।

আমাকে অনেকেই বলেন কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ জলপাইগুড়িতে হলে শুধুমাত্র আইনজীবিদের রোজগার বৃদ্ধি পাবে। আম জনতার কী লাভ? এটা ঠিক বহু নাগরিক সারা জীবনে হয়ত নিজস্ব মামলায় জেলা কোর্ট বা হাইকোর্ট পর্যন্ত যাননি। তবে যারা বিচারের প্রার্থনায় উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক জেলাগুলি থেকে কলকাতায় গিয়ে হাইকোর্টে নিজের কেসের ব্যাপারে তদ্বির তদারকি করেন— তাদের অমানুষিক ঝামেলা দিনের পর দিন সহ্য করতে হয়। প্রথমত ট্রেনের টিকিট অর্থাৎ রিজার্ভেশন পাওয়া গেলে ভাল, না পেলে জেনারেল বগিতে রাত জেগে যাত্রা। হোটেলের খরচ, কোর্টেও নানা রকম খরচ করতেই হয়। উকিলবাবু ও তার সহকারীর ফিজ কিন্তু দিনে দিনে বাড়ছে। যত বড় উকিল তত বেশি ফিজ, এটাই স্বাভাবিক। তারপরেও ডেটের পর ডেট পরে, তার পিছনে অবশ্যই আইনগ্রাহ্য যুক্তি থাকে। শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে প্রবীণ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী বন্ধুবর, অলোক কুমার চক্রবর্তীকে শিয়ালদহ প্ল্যাটফর্মে অসুস্থ হয়ে শুয়ে পড়ার কথা জানি। জলপাইগুড়িতে সার্কিট বেঞ্চ স্থাপিত হলে এলাকার মানুষজন কাজ পাবেন। হোটেল ও পরিবহণ ব্যবসার প্রভূত উন্নয়ন ঘটবে। ছোট ছোট সাইবার কাফে, জেরক্সের দোকান, স্ট্যাম্প ভেন্ডার, ছোট ছোট চা ও পানের দোকান বহু মানুষের কর্মসংস্থান ঘটাবে। আইনের পেশার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত আইনজীবিদের চেম্বারে বহু জুনিয়র কাজ পাবে। আইন শিক্ষার প্রতি ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ অবশ্যই বাড়বে। বর্তমানে যারা আইন পাশ করেন, শোনা যায় তাদের ৩০ শতাংশ মাত্র পেশাগতভাবে আইন ব্যবসায় যোগ দেন। জেলা কোর্টগুলোতে দেখবেন এই নেতিবাচক অবস্থার মধ্যে বহু তরুণ তরুণী আইন ব্যবসাকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করে লড়াই করছেন। ডিজিটাল প্রজন্মের তরুণ তরুণীরা প্রত্যাশা করছেন— সার্কিট বেঞ্চ চালু হলে তাদের জীবন জীবিকার নতুন দিগন্ত উন্মোচন হবে।

আইন কলোনি—প্রায় সাড়ে ছয় হাজার বর্গমিটার এলাকা জুড়ে ৭২টি স্টাফ কোয়ার্টার তৈরি হবে জি-৩ মডেলে। প্রায় এক হাজার বর্গমিটার অডিটোরিয়াম তৈরি হবে মূল আদালত ভবনে। ৩০০ জনের বসার বন্দোবস্ত থাকবে এই শীততাপ নিয়ন্ত্রিত অডিটোরিয়ামে। ২০০টি গাড়ির পার্কিংয়ের ব্যবস্থার সঙ্গে আরও ৭২টি গাড়ি রাখা যাবে ঢাকা জায়গায়। গোটা এলাকা থাকবে সিসি টিভির নজরদারিতে। বিদ্যুতের সাব স্টেশন, এয়ার কন্ডিশন প্ল্যান্ট ইত্যাদি এবং একাধিক ওভারহেড জলের ট্যাঙ্ক থাকবে।

মনে আছে এই জেলা শহরবাসীর, ১ সেপ্টেম্বর ২০১২ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী পদব্রজে কিং সাহেবের ঘাটে নির্মিত ইন্সপেকশন বাংলো থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে বিশ্ববাংলার ক্রীড়াঙ্গনে পৌঁছলেন। পথের দু'ধারে অগণিত মানুষ তাকে শুভেচ্ছা জানালেন। সে কী উন্মাদনা। সেদিন ওনার সঙ্গে ছিল মাননীয় শ্রীযুক্ত জয়নারায়ণ প্যাটেল, তৎকালীন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। আসলে সেদিনের অনুষ্ঠান ছিল সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী পরিকাঠামো নির্মাণের শুভ সূচনা। আমি নিজে সার্কিট বেঞ্চের দাবিতে সংগঠিত বহু মিটিং মিছিলে নীরবে অংশগ্রহণ করেছি। তবে ওই ১ সেপ্টেম্বরের আবেগ ছিল আকাশছোঁয়া।

কিছুদিন আগে শ্রী কমল কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমি একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পাশাপাশি ছিলাম। কমল একটা গভীর কথা হালকা চালে বলেছিল— 'কেন্দ্র রাজি, রাজ্য রাজি, শাসক পক্ষ-বিরোধী পক্ষ রাজি, জেলা কোর্ট-হাইকোর্ট রাজি, অর্থাৎ সবাই সার্কিট বেঞ্চ জলপাইগুড়িতে স্থাপনের পক্ষে— তাহলে দেরি কেন?' এটা ভাববার বিষয়। এই মুহূর্তে শহরবাসী আশা করে স্থায়ী পরিকাঠামোর কাজ যখন শুরুই হল— তখন প্রস্তুত করে রাখা অস্থায়ী পরিকাঠামোয় সার্কিট বেঞ্চের কাজ শুরু হোক না। তাহলে কলকাতা থেকে কাগজপত্র অনেকটাই এখানে চলে আসবে এবং স্থায়ী পরিকাঠামো তৈরি হলে কাজ চালু করতে বিলম্ব হবে না। উত্তরবঙ্গের মোকদ্দামায় জড়িত মানুষের সমস্যা কিছুটা লাঘব হবে। আমরা হয়ত আগামী প্রজন্মকে বলতে পারব অস্থায়ী পরিকাঠামো বিফলে যায়নি।

(পঞ্চাশ বছরের দাবি ও প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ শুরু হল। গত মার্চ ২০১৮ সংখ্যায় 'উত্তরপক্ষ' কলমে প্রকাশিত হয়েছিল এই প্রতিবেদন। উত্তরের মানুষের সঙ্গে সার্কিট বেঞ্চের এই ঐতিহাসিক সূচনার সাক্ষী থাকতে আমরা একই রচনার পুনর্মুদ্রণ করলাম।

—সম্পাদক)

শারীরিক নিগ্রহ হলে নির্যাতিতার কী কী করণীয় ?

রাখি পুরকায়স্থ

নারী নির্যাতন বিরোধী বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আইন আমাদের দেশে রয়েছে। তবে আইনি সচেতনতার অভাব, প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তা, সরকারি পরিকাঠামোগত সমস্যা এবং সর্বোপরি নারীদের নিরাপত্তাহীনতার মূল কারণগুলি সম্পর্কে আমাদের ত্রুটিযুক্ত মনোভাবের জন্য অপরাধীদের সাজা দেওয়া অনেকক্ষেত্রেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বিশেষভাবে যৌন নিগ্রহ বা ধর্ষণের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময়ই সঠিকভাবে সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয় না। তাই শেষ পর্যন্ত ছাড়া পেয়ে যায় অপরাধীরা। খুনের মত, যৌন নিগ্রহ বা ধর্ষণও Medico-legal শ্রেণিভুক্ত অপরাধ, তাই প্রমাণ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম রয়েছে। এর থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, যৌন নিগ্রহ বা ধর্ষণের মামলায় তাই পুলিশ এবং ডাক্তারের ভূমিকা ঠিক কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। তবে দুর্ভাগ্যের বিষয়, প্রমাণ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট সেই নিয়মগুলি অনেক সময়ই সঠিকভাবে মেনে চলা হয় না!

শারীরিকভাবে নিগৃহীত হলে নির্যাতিতার তৎক্ষণাৎ কি করণীয়?

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্থানীয় থানায় গিয়ে নির্যাতিতাকে লিখিত অভিযোগ জানাতে হবে। অভিযোগ দায়ের হলে পুলিশ প্রয়োজনীয় শারীরিক প্রমাণ সংগ্রহের জন্য 'বিশেষ' ডাক্তারি পরীক্ষার নির্দেশ জারি করবে। কারণ, পুলিশের নির্দেশেই কেবলমাত্র সরকার অনুমোদিত ডাক্তারেরা নির্যাতিতার দেহ পরীক্ষা করে শারীরিক নিগ্রহের আদালত-গ্রাহ্য প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারেন। সরকারি ডাক্তারকে দিয়ে 'বিশেষ' ডাক্তারি পরীক্ষা করাবার আজ্ঞাপত্র পুলিশের কাছ থেকে আদায় করে সরকারি হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছলে, নির্ধারিত পদ্ধতি মেনে ডাক্তার সেই নির্যাতিতা নারীর শারীরিক পরীক্ষা করেন। যেখানে নিগ্রহের প্রকৃতি শুধু আঘাত সংক্রান্ত, সেখানে ডাক্তার মেডিকেল রিপোর্টে আঘাতের বিবরণ দিয়ে লিখবেন আঘাতটা সাধারণ (আঁচড়, কামড়, কালশিটে, কেটে যাওয়া, ছড়ে যাওয়া বা অন্য কোন প্রকার আঘাত যা দীর্ঘস্থায়ী নয়); না কি গুরুতর (হাত-পায়ের হাড় ভেঙ্গে যাওয়া, চোখে, কানে, মাথায় বা মুখে প্রচণ্ড আঘাত কিংবা এমন আঘাত যার জন্য অন্তত ২০ দিন তীব্র ব্যথা-বেদনা থাকে); না কি ভয়াবহ (যেক্ষেত্রে মহিলার জীবনহানির প্রবল আশঙ্কা তৈরি হয়)। ধর্ষণের ক্ষেত্রে অতি দ্রুত ডাক্তারি পরীক্ষা হওয়া অত্যন্ত জরুরি। ধর্ষকের রক্ত, বীর্য, মুখের লালা, চুল, দেহ লোম ইত্যাদি যদি নিগৃহীতার পোষাক বা দেহ থেকে সংগ্রহ করা যায়, তাহলে দোষী ব্যক্তির শনাক্তকরণ অনেকটাই সহজ হতে পারে। সরকারি ডাক্তার তাঁর তৈরি মেডিক্যাল রিপোর্ট ও নির্যাতিতার দেহলব্ধ শারীরিক প্রমাণগুলি সংরক্ষণ করে পুলিশকে সময়মত জমা দেবেন। তৎপরবর্তীতে নির্যাতিতার দেহলব্ধ শারীরিক প্রমাণগুলি পাঠানো হবে সেন্ট্রাল ফরেনসিক ল্যাবরেটরিতে।

উপরে বর্ণিত পদ্ধতিটি একটি Medico-legal নিয়ম মাত্র, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সঠিকভাবে পালন করা হয় না। অনেক সময়ই স্থানীয় থানা লিখিত অভিযোগ নিতে চায় না। কখনও বা পুলিশ অভিযোগ গ্রহণ করলেও, অনেকক্ষেত্রেই আবার দেখা যায়, নির্যাতিতার দেহলব্ধ শারীরিক প্রমাণগুলি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি সরকারি হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে থাকে না। ধর্ষিতার শারীরিক পরীক্ষা কিংবা চিকিৎসার দায়িত্ব নিতেও সরকারি ডাক্তারেরা অনেক সময় নানান অজুহাত দেখিয়ে টালবাহানা করেন। শুধু তাই নয়, যেসব নারী প্রত্যন্ত গ্রামে থাকেন, তাদের বাসস্থান থেকে নিকটতম সরকারি হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রও অনেক দূরে। গরিব নির্যাতিতার পক্ষে সেখানে তড়িঘড়ি পৌঁছবার আর্থিক কিংবা শারীরিক সামর্থ্য কোনওটাই থাকে না। অর্থাৎ বাড়ির কাছেপিঠে তেমন সরকার অনুমোদিত স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতাল না থাকলে আইনি পদ্ধতি মেনে তাড়াতাড়ি ডাক্তারি পরীক্ষা করানো সম্ভবপর হয় না। ফলত ধর্ষণের মত যৌন অপরাধের ক্ষেত্রে যেখানে অতি শীঘ্র ধর্ষিতার বিশেষ ডাক্তারি পরীক্ষা হওয়া প্রয়োজন, সেখানে অনেক ক্ষেত্রেই তা করা হয় না!

ভাঁওরি দেবী গণধর্ষণ মামলা

আমাদের দেশের অপ্রতুল Medico-legal পদ্ধতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ 'ভাঁওরি দেবী গণধর্ষণ মামলা'। রাজস্থানের রাজধানী শহর জয়পুর থেকে প্রায় ৩০ মাইল দূরে একটি প্রত্যন্ত গ্রাম ভাতেরি। গ্রামে উঁচু জাতের, বিশেষত অবস্থাপন্ন গুজ্জরদেরই, আধিপত্য। সেখানে নিচু জাত (দলিত) 'কুম্হার'রাও আছেন। তাঁরা পেশায় কুমোর। তবে একটা ব্যাপারে উঁচুনিচু সব জাত এক, আর তা হল বাল্যবিবাহ! ভাঁওরি দেবীর কাহিনি

অনেক সময়ই স্থানীয় থানা লিখিত অভিযোগ নিতে চায় না। কখনও বা পুলিশ অভিযোগ গ্রহণ করলেও, অনেকক্ষেত্রেই আবার দেখা যায়, নির্যাতিতার দেহলব্ধ শারীরিক প্রমাণগুলি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি সরকারি হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে থাকে না। ধর্ষিতার শারীরিক পরীক্ষা কিংবা চিকিৎসার দায়িত্ব নিতেও সরকারি ডাক্তারেরা অনেক সময় নানান অজুহাত দেখিয়ে টালবাহানা করেন। শুধু তাই নয়, যেসব নারী প্রত্যন্ত গ্রামে থাকেন, তাদের বাসস্থান থেকে নিকটতম সরকারি হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রও অনেক দূরে। গরিব নির্যাতিতার পক্ষে সেখানে তড়িঘড়ি পৌঁছবার আর্থিক কিংবা শারীরিক সামর্থ্য কোনওটাই থাকে না।

জানতে আমাদের ফিরে যেতে হবে ১৯৯২ সালে। দিনটা ছিল ২২ সেপ্টেম্বর। রাজস্থানের ভাতেরি গ্রামে খেতে কাজ করছিলেন দরিদ্র কুম্হার রমণী ভাঁওরি দেবী। এমন সময় চার গুজ্জর - গেরসা, বদ্রি, রামসুখ, রামকরণ, আর এক ব্রাহ্মণ - শ্রাবণ পাণ্ডা ধর্ষণ করে ভাঁওরি দেবীকে।

কেন এই ধর্ষণ? আশির দশকের মাঝামাঝি থেকেই ভাঁওরি দেবী রাজস্থান সরকারের নারী উন্নয়ন প্রকল্পে আড়াইশো টাকা মাস মাইনের 'সাথিন'। তাঁর কাজ গ্রামের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে মহিলাদের (সেই সূত্রে পুরুষদেরও) বোঝানো - বাল্যবিবাহ একটি কুপ্রথা। 'আখা তিজ', মানে অক্ষয়তৃতীয়া তিথিতে রাজস্থানের গ্রামে-গ্রামে তখন ব্যাপক হারে বাল্যবিবাহ হত। সাথিনদের কাছে সরকারি নির্দেশ এসেছিল, যেমন করেই হোক বাল্যবিবাহ রোধ করতে হবে। সোজা কথায় কাজ না হলে প্রকল্পের দিদিদের জানাতে হবে। দিদিরা প্রশাসনকে বলে পুলিশ ডাকবেন। ভাঁওরি দেবীর গ্রামে সেই সময় দুটো বাল্যবিবাহের তোড়জোড় চলছিল। তিনি তড়িঘড়ি সেই বিয়ে দুটি ঠেকাতে নেমে পড়লেন। তারপরই হুমকি পেতে শুরু করেছিলেন ভাঁওরি দেবী। এতে কিন্তু তিনি মোটেই ভয় পেয়ে পিছিয়ে আসেননি, বরং বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে আরও জোরদার ব্যবস্থা নিতে লাগলেন। ১৯৯২ সালের ২২ সেপ্টেম্বরের 'ভাঁওরি দেবী গণধর্ষণ কাণ্ড' তারই প্রতিশোধের প্রতিশব্দ!

যে মেয়ে কোনদিন ইস্কুলের গণ্ডি মাড়াননি, যিনি কিনা এক বর্ণ লিখতে পড়তে পারেন না, 'নারীবাদ', 'মানবাধিকার', 'লিঙ্গ বৈষম্য' ইত্যাদি শব্দগুলো যাঁর কাছে একেবারেই অজানা, সেই ভাঁওরি দেবী পথে নামলেন, গেলেন আদালতে। তারপর তাঁর সাথে যা-যা হয়েছিল তা নিম্নরূপ-

পুলিশ প্রথমে অভিযোগ নিতে চায়নি, কারণ তারা বিশ্বাস করেনি তিনি ধর্ষিত হয়েছেন।

পরে পুলিশ অভিযোগ নিতে রাজি হয়, এবং তাঁকে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য সরকারি হাসপাতালে যেতে বলে। ভাঁওরি দেবী হাসপাতালে গেলে সরকারি ডাক্তার তাঁর পরীক্ষা করতে অস্বীকার করেন, কারণ হাসপাতালে তখন কোনও মহিলা ডাক্তার ছিলেন না। অন্য কোন মহিলা ডাক্তারের খোঁজ না করেই ভাঁওরি দেবীকে জয়পুর শহরের হাসপাতালে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

পরের দিন জয়পুরের হাসপাতালেও ভাঁওরি দেবীর শারীরিক পরীক্ষা করা হয় না, কারণ ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য পুলিশ যে আজ্ঞাপত্রটি দিয়েছিল তা 'বয়স নির্ধারণের নির্দেশপত্র', ধর্ষণসংক্রান্ত পরীক্ষা করবার নির্দেশপত্র নয়!

ভাঁওরি দেবী আবার ধর্ষণসংক্রান্ত নির্দেশপত্র নিতে স্থানীয় থানায় যান। কিন্তু তাঁকে সেখানে অন্যায়ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়ে রাখা হয়। পরের দিন ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে নির্দেশপত্র দেন।

অবশেষে ভাঁওরি দেবীর শারীরিক পরীক্ষা যখন করা হয়, তখন ধর্ষণের পর ৫২ ঘণ্টা অতিক্রান্ত! স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় কারণেই অনেক জরুরি প্রমাণই ততক্ষণে অন্তর্হিত। আইনত ধর্ষণের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যোনি থেকে নমুনা সংগ্রহ করবার কথা। ধর্ষণের পর ৪৮ ঘণ্টা পার হয়ে গেলে নিয়মানুযায়ী এণ্ডোসারভেইক্যাল নমুনা সংগ্রহ করতে হয়, কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত ডাক্তার সেটি করেননি। তাই সম্পূর্ণ পরীক্ষাটাই দোষীদের শনাক্তকরণের পরিপ্রেক্ষিতে একেবারেই অর্থহীন হয়ে যায়।

তিন বছর ধরে চলা মামলায় বিচারক পাল্টেছিল ছ'বার। তার পর? ১৯৯৫ সালের ২৫ নভেম্বর আদালতের রায়ে পাঁচ অভিযুক্তের প্রত্যেকেই বিনা প্রমাণে বেকসুর খালাস পেয়েছিল। ভাঁওরি দেবী ও তার স্বামী মোহনলালের সাক্ষ্যকে কেউ পাত্তাই দেয়নি।

ভাঁওরি দেবী ন্যায় বিচার পাননি। ভাঁওরি দেবী গণধর্ষণ কাণ্ডের ২৬ বছর পরেও, আমাদের দেশের প্রত্যন্ত গ্রামগুলির বাসিন্দা ন্যায় বিচারপ্রার্থী বহু নিগৃহীতা একই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, এমনকী শহুরে নির্যাতিতারাও এই তালিকা থেকে বাদ পড়ছেন না। এ কথা সত্যি, সময়মত ডাক্তারি পরীক্ষা হলেই যে দোষীরা নিশ্চিতভাবে শাস্তি পাবে তা নয়। তবে ডাক্তারি পরীক্ষার দ্বারা নির্যাতিতার দেহলব্ধ শারীরিক প্রমাণগুলি দ্রুত সংগ্রহ করতে পারলে, নির্যাতিতাকে ন্যায় বিচার দেওয়ার পথটি আরও কিছুটা মসৃণ হয়। প্রযুক্তিগত বাধা আমরা অবশ্য অনেকটাই কাটিয়ে উঠেছি। প্রকৃত অপরাধী শনাক্তকরণে সাহায্য করতে বর্তমানে ডিএনএ আলেখন (DNA Fingerprinting) পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে। অনুসন্ধানীরা অপরাধের জায়গায় অপরাধী দ্বারা পরিত্যক্ত কোনও পদার্থ পেলে তা সংরক্ষণ করে পরীক্ষাগারে নিয়ে যান। সেই পরিত্যক্ত বস্তু এক ফোঁটা রক্ত, গায়ের চামড়া, চুল কিংবা বীর্যও হতে পারে। যত জন সন্দেহভাজন লোক ধরা পড়ে তাদের প্রত্যেকের ডিএনএ সংগ্রহ করে, সকল ডিএনএ এর আলাদা আলাদা ডিএনএ আলেখ্য তৈরি করা হয়। অপরাধের জায়গা থেকে পাওয়া প্রমাণস্বরূপ ডিএনএ থেকে যে ডিএনএ আলেখ্য পাওয়া যায়, তার সঙ্গে আবার সকল সন্দেহভাজন লোকের ডিএনএ আলেখ্যের তুলনা করলে বোঝা যায় কে প্রকৃত অপরাধী।

প্রকৃত দোষীকে শনাক্তকরণের প্রক্রিয়া নিঃসন্দেহে অনেকটাই সহজতর হয়েছে, তবে প্রত্যক্ষদর্শী না থাকলে শুধুমাত্র অবস্থাঘটিত প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে অনেক সময়ই ন্যায় বিচার মেলে না। যদিও বা প্রমাণ হয় পুরুষটির সাথে নারীটির যৌনমিলন হয়েছিল, কিন্তু সেটা যে ধর্ষণ তা প্রমাণ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। আজও ধর্ষিতা নারীর জাত, ধর্ম, আর্থ-সামাজিক অবস্থান, চরিত্র, জীবনযাত্রা ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের সামাজিক মনোভাব Medico-legal পদ্ধতিকে প্রভাবিত করে! পার্ক স্ট্রীট গণধর্ষণ কাণ্ড এর সাম্প্রতিকতম উদাহরণ! অর্থাৎ নারীদের জন্যে আইন অবশ্যই রয়েছে, কিন্তু তার সুপ্রয়োগে এখনও অন্তরায় কম নয়!

এখন ডুয়ার্স-এ বিজ্ঞাপন দিন

General Rates for Display Ads (INR)

Full Page, Colour:15,000
Full Page, B/W: 9,000
Half Page, Colour: 8,000
Half Page, B/W: 6,000
Back Cover: 30,000
Front Inside Cover: 20,000
Back Inside Cover: 20,000
Double Spread: 30,000

Special Rates for Local Trade only

Strip Ad, Colour: 6,000
Strip Ad, B/W: 4,000
1/4 Page Ad, Colour: 2,500
1/4 Page Ad, B/W: 1,500
1/6 Page, Colour: 1,500
1/6 Page, B/W: 1,000

Mechanical Details: Full Page Bleed {21cm (W) X 28 cm (H)}, Non Bleed {18cm (W) X 25 cm (H)}, Half Page Horizontal {18 cm (W) X 12 cm (H)}, Vertical {8.5 cm (W) X 25 cm (H)}, Strip Ad Vertical {5.6 cm (W) X 25 cm (H)}, Horizontal 18 cm (W) X 6.5 cm (H), 1/4 Page 8.5 cm (W) X 12 cm (H), 1/6 Page {5.75 cm (W) X 12.2 cm (H)}

Rates are effective from April 1, 2018 issue

বিজ্ঞাপন দিতে বা বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
কলকাতা ৯৯০৩৮৩২১২৩
উত্তরবঙ্গ ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬

এখন ডুয়ার্স

নুরানাঙের লড়াই ও ওরা তিনজন

তিলক পুরকায়স্থ

চলুন ঘুরে আসি উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাণী আগেকার নেফা বা আজকের অরুণাচল প্রদেশ। উদিত সূর্যের টিকা সর্বপ্রথম এখানেই লাগে, তাই অরুণাচল। আমরা যাচ্ছি অনেক জায়গার সঙ্গে তাওয়াং। আচ্ছা কেমন হয় যদি তাওয়াং ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে তাওয়াং এর এক উজ্জ্বল ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় হয়। জানা উচিত ছিল কিন্তু অজানা। তাহলে তো রথ দেখা ও কলা বেচা, দুটোই হয়ে যাবে এক সঙ্গে। এই ইতিহাস যতই গৌরবময় হোক না কেন, ইতিহাস বইয়ের পাতায় তা পড়ানো হয় না। কারণ ফরমাইসি ইতিহাস লেখকদের সত্যি কথা বলার সাহস নেই।

"কর চলে হাম ফিদা, জান-ও-তান সাঁথিও; অব তুমহারে হাওয়ালে বতন সাঁথিও।" চিন ভারত যুদ্ধের সময় চেতন আনন্দ এর ক্লাসিক সিনেমা 'হকিকৎ' এর এই অমর গানটি হয়ত আমাদের অনেকেরই মনে আছে, কিন্তু এর চরিত্রগুলিকে কি মনে পড়ে? এগুলি কিন্তু কেবলমাত্র সিনেমার কাল্পনিক চরিত্র নয়, একেবারে বাস্তব চরিত্র। যদি না পড়ে তবে শুনুন সেই অরুণাচলের গল্প।

ব্রিটিশ ভারতে প্রায়ই তিব্বত থেকে চিনা সেনারা এসে হানা দিত, কখনও কখনও তিব্বতি দস্যুরা ভারতে ঢুকে লুটপাট চালাত। বাধ্য হয়ে তখন ভারত সরকার থেকে ব্রিটিশ ভারতের বিদেশ সচিব স্যর হেনরি

ম্যাকমোহনকে দায়িত্ব দেওয়া হয় এর সমাধান সূত্র বের করতে। সেইমত ১৯১৪ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে তিব্বতের শাসক গোষ্ঠীর মধ্যে চুক্তিপত্র হয় সর্বমোট ৫৫০ মাইল সীমারেখা বিভাজন নিয়ে। এরই নাম ম্যাকমোহন লাইন এবং চুক্তিটি সিমলা একর্ড নামেও প্রসিদ্ধ। স্বাধীন ভারত সরকার এই সীমারেখা মেনে চললেও, তিব্বতকে কুক্ষিগত করার পরে চিনা সরকার এসব চুক্তিপত্র নিয়ে তামাশা শুরু করে। চিনের সরকারি মানচিত্রে বারবার করে আসাম থেকে অরুণাচল-এই বিস্তীর্ণ জায়গার প্রায় ২৫০০০ স্কোয়ার মাইল দক্ষিণ তিব্বত বলে দেখানো হচ্ছিল।

ভারত স্বাধীন হবার পরে তৎকালীন শাসকদের উচ্চাকাঙ্খা অত্যন্ত প্রকট হয়ে ওঠে। দেশের নেতারা তখন বিশ্বনেতা হওয়ার স্বপ্নে অনেক কিছু উল্টো পাল্টা পদক্ষেপ করেন। যথা - কাশ্মীর সমস্যা ইউনাইটেড নেশনস সিকুরিটি কাউন্সিল এর দরবারে পাঠিয়ে দেওয়া, চিনের সঙ্গে গলাগলি করে পঞ্চশীল নীতি রূপায়ণ, আরও কত কী! ষাটের দশকের শুরুতে চতুর্দিকে শুধু হিন্দি-চিনি ভাই ভাই ধ্বনি। আমরা মূর্খ ভারতবাসী আহ্লাদে আটখানা, গৌতম বুদ্ধের শান্তির বাণী প্রচারের দায়িত্ব যেন আমাদের কাঁধে। আর আমাদের মিত্র চিন তখন ব্যস্ত লাইন অফ রিয়েল কন্টোল প্রতিষ্টা করতে। গুটি গুটি করে তারা এগিয়ে আসছে বুমলা পাস ধরে। সমগ্র তাওয়াং জেলা তখন চিনের অধিকারে। সেখান থেকে আরও নেমে আসছে বমদিলার দিকে, লক্ষ্য সমগ্র নেফা দখল করা। দিনের পর দিন শয়ে শয়ে বাঙ্কার তৈরি করে ঘাঁটি গেঁড়ে বসেছে অথচ মূর্খ দেশ ও তার শাসকেরা তার কোনও খবরই রাখে না।

গাড়ওয়ালের এর গ্রামের ছেলে যশবন্ত, ছোটবেলা থেকেই ডানপিটে, খেলাধুলায় তুখোড়। আর কী নিশানা পিট্টু খেলার সময়! ওর গ্রামের অনেকেই সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়েছে। তাঁরা যখন গ্রামে আসে, বালক যশবন্ত হাঁ করে ওদের গল্প শোনে, দু চোখে স্বপ্ন-একদিন ওঁদের মত সেনাবাহিনীতে যোগ দেবে, অনেক নাম হবে, ইজ্জত হবে, বাবা-মার সম্মান বাড়বে গ্রামে। এই নিখুঁত নিশানাবাজিই একদিন সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ যশবন্তকে টেনে নিয়ে গেল সেনাবাহিনীতে এবং সহজেই চাকরি হয়ে গেল গাড়োয়াল রেজিমেন্টের ফোর্থ ব্যাটালিয়নে, রাইফেলম্যান হিসেবে। পোস্টিং হল সুদূর ভারত চিন সীমান্তের বর্তমান অরুণাচল বা তৎকালীন নেফাতে। জীবনে প্রথমবার বাবা-মা কে ছেড়ে এতদূর আসা। যশবন্ত-এর মন খুব খারাপ। প্রায়ই ছোট বোনটার কথা মনের পড়ে। ভাইয়া জলদি ওয়াপাস আনা। মেরে লিয়ে বিন্দি ঔর চুরিয়া লেকে আনা। বলেই তার সে কী হাপুস

নয়নে কান্না। দূর প্রবাসে বসে দাদারও চোখ ছলছল করে ওঠে। কিচ্ছু ভাল লাগে না। একে অচেনা জায়গা, অজানা পরিবেশ, তার সঙ্গে উচ্চতাজনিত সমস্যা। সারাক্ষণ মাথা ভার হয়ে আছে,ক্যাম্পের খাওয়া দাওয়া আর মুখে রোচে না। কতদিন হয়ে গেল মার হাতের রান্না খাওয়া হয়নি। উদাস মনে ক্যাম্পের বাইরে গ্রামের রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

যশবন্ত-র এই উদাস ভাব, তার বড় বড় দুঃখী চোখ, চোখ এড়ায় না মনপা উপজাতির সুন্দরী কন্যা সেলার। এমনিতেই ক্যাম্পের পাস দিয়েই গ্রামে যাবার রাস্তা। সেলার বাবাই ক্যাম্প এর ঠিকাদার হওয়াতে ওকেও জিনিসপত্র নিয়ে মাঝে মধ্যে ক্যাম্প এ আসতে হয়।

তাওয়াং জেলার সর্বাধিক উন্নত জনজাতি মনপারা বৌদ্ধ ধর্মে গেলুক সম্প্রদায়ে ভুক্ত। সুভদ্র, ধর্ম ভীরু,মনপাদের ঘরে ঘরে বুদ্ধদেবের মূর্তি, ছোট জলপূর্ণ পাত্র ও জ্বলন্ত ঘিয়ের প্রদীপ থাকবেই। অত্যন্ত অতিথিবৎসল হিসাবে এদের সুনাম। আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে মহামান্য দলাই লামা এই সম্প্রদায় ভুক্ত।

আর্মি অফিসারদের সম্মতি নিয়েই প্রতিদিন দুবেলা যশবন্ত এর জন্য খাবার নিয়ে আসে সুন্দরী সেলা। ক্রমশ সেলা রেজিমেন্টের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে ওঠে। তার এই নতুন অভিজ্ঞতা, প্রথম ভাললাগার অনুভূতি, সংগোপনে জানায় তার প্রিয় বান্ধবী নুরাকে - যখন প্রথম ফুটেছে কলি আমার মল্লিকা বনে। এর পরে মাঝেমধ্যেই এই দুই অসম নরনারী - যাদের জাত, ধর্ম, ভাষা সবই আলাদা, তাদের নির্বাক ভালবাসা প্রত্যক্ষ করতে সেলার সঙ্গে ক্যাম্পে উপস্থিত হত নুরা।

ডুয়ার্স প্যাকেজ টুর

২ রাত ৩ দিন: গরুমারা-ঝালং-বিন্দু-সামসিং-সুনতালেখোলা। ৩ রাত ৪ দিন: গরুমারা-ঝালং-বিন্দু-সুনতালেখোলা-জল্পেশ তিনবিঘা-কোচবিহার। ৪ রাত ৫ দিন: গরুমারা-ঝালং-বিন্দু-সামসিং-সুনতালেখোলা জল্পেশ-তিনবিঘা-কোচবিহার- জলদাপাড়া-বক্সা।

নিউ জলপাইগুড়ি/নিউ মাল থেকে, ইকনমি/ডিলাক্স প্যাকেজ

যোগাযোগ ৯৮৩০৪১০৮০৮/৯৯৩৮৩২১২৩

DHUPJHORA SOUTH PARK

Murti, Gorumara NP Jalpaiguri, West Bengal

Accommodation: Super Delux Room (DBR) 4 nos, Delux Ethnic Rooms (DBR) 4 nos, Standard Family Rooms (4-6 BR) 5 nos.

Common Dine-in place for breakfast- lunch- evening snacks-dinner, Conference Hall; Cycling, Angling, Adventure sports like Burma Bridge, Cylinder Walk, Bosun Chair, Commando Walk and Zip Line.

Marketing & Booking Contact:

Kolkata 9903832123, 9830410808 | Siliguri 9434442866, 9002772928

১৫ নভেম্বর ১৯৬২। গাড়োয়াল রাইফেলসের ফোর্থ ব্যাটালিয়নের সর্বমোট ১৬২ জন অফিসার ও জওয়ান সেদিন পোস্টে উপস্থিত। বাইরে পাহারারত জওয়ানদের চোখে পড়ল - আগুয়ান চিনা সেনাবাহিনী। বন্যার স্রোতের মতন চিনা সেনা ধেয়ে আসছে। প্রত্যেকটি সৈনিকের হাতে স্টেনগান। আর আমাদের হাতে? সে না বলাই ভাল। গ্রেনেড ছাড়া মারণাস্ত্র বলতে প্রায় কিছুই নেই।

সেদিন ঘটনাক্রমে আবার সকাল সকাল ক্যাম্পে সেলা ও নুরা দুজনেই উপস্থিত।

"তুম লোগ আভি পিছে সে ভাগ, মরনে কো লিয়ে আয়ে ক্যা ? দেখ নেহি রাহা হো, জং শুরু হো গিয়া।"

"তুমহে ছোড়কে জানে কা কৈ সওয়ালই নেহি হ্যায়।"

"ঔর নুরা, তুম কাঁহে খাড়ি হো?"

ম্যনয় ভি মউত সে ডরতা নেহি, তুম দোনো কো ছোড়কে নেহি যায়েঙ্গে।"

ততক্ষনে শত শত চিনা সেনা ঘিরে ফেলেছে ভারতীয় শিবির। চিনা সেনাদের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের সামনে মান্ধাতার আমলের অস্ত্রে সজ্জিত ১৬২ জন ভারতীয় সেনা ও অফিসার মরণপণ লড়াই চালাচ্ছে। এই অসম লড়াইয়ে আস্তে আস্তে এক এক করে ভারতীয় বীর সেনারা শহীদ হয়ে যাচ্ছেন। তা সত্ত্বেও তিন তিন বার চিনারা পোস্ট আক্রমণ করেও, শিবির অধিকার করতে ব্যর্থ হয়। পোস্টে তখন কেবলমাত্র জীবিত সৈনিক যশবন্ত, ল্যান্স নায়েক ত্রিলোক সিং নেগি ও রাইফেল ম্যান গোপাল সিং গোঁসাই। আর অবশ্যই আছে সেলা ও নুরা, পরবর্তী ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে যারা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল।

'ইস আমাদের যদি একটাও ওদের মত এমএমজি থাকত তাহলে এই কুত্তাগুলোকে দেখে নিতাম।' যশবন্ত এর কথায় বাকি দুজন মাথা নাড়াল। তিনজনে মিলে পরামর্শ করে ঠিক হল-মরতে যখন হবেই, তখন মেরেই মরব। একটাও চিনা এমএমজি যদি ছিনিয়ে আনা যায়, তাহলেও উচিত শিক্ষা দেওয়া যাবে। সেইমত জীবন বাজি রেখে তিনজনেই এগিয়ে গেল চিনা সেনাদের দিকে, প্রায় ১২ মিটারের মধ্যে পৌঁছে ক্রমাগত গ্রেনেড নিক্ষেপ করতে থাকে। এই অতর্কিত আক্রমণে চিনারা হকচকিয়ে যায় এবং সেই সুযোগে যশবন্ত একটা এমএমজি ও ভাল পরিমাণ কার্তুজ ছিনিয়ে নিয়ে আসতে সমর্থ হয়। যদিও ততক্ষনে ক্যাম্পের বাকি দুজনও শহীদ হয়ে গেছে। যশবন্তও সাংঘাতিক আহত।

এর পরের ঘটনা ইতিহাস। যশবন্ত তখন একা কুম্ভ হয়ে ক্যাম্প রক্ষা করছেন এবং অবিশ্বাস্য লাগলেও সত্যি, তাঁকে ক্রমাগত গোলাবারুদ জুগিয়ে যাচ্ছে দুই বীর কন্যা সেলা ও নুরা।

কেউ যদি যশবন্তগড় গিয়ে থাকেন তবে দেখেছেন যে এটি একটি উঁচু টিলায় অবস্থিত। এই স্ট্র্যাটেজিক সুবিধার পুরো সদব্যবহার করতে থাকে ওরা তিনজনে। শত্রুকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য তিনটে আলাদা আলাদা জায়গা থেকে উপর্যপুরি গুলি ছোঁড়া চলতে থাকে। ছিনিয়ে নেওয়া চিনা এমএমজি অত্যন্ত নির্ণায়ক ভূমিকা নেয়।

চিনা সেনারা ভাবতেও পারেনি, এক প্লাটুন নয়, মাত্র একজন ভারতীয় সেনা পুরো ক্যাম্প আগলে রেখেছে। কিন্তু গোলাবারুদের ভাঁড়ার ও ক্রমে ফুরিয়ে আছে। সমানে রক্তক্ষরণের জন্য শরীরও অত্যাধিক দুর্বল লাগছে, আর চলছে না। মা-মাগো! বড় কষ্ট হচ্ছে মা! কেবলই তোমার কথা মনে পড়ছে। চোখের পাতা কেন ভারি হয়ে আসছে জানি না, মাথাটাও ঠিকমতন কাজ করছে না। মাগো আমার যাবার সময় হয়ে এসেছে। আর কোনওদিনও হয়তো দেখা হবে না। আমাকে ক্ষমা করে দিও মা'... 'কে কাঁদে! ও সে! কেঁদো না লক্ষ্মীটি, তুমি তো শেরনি। পরজন্ম বলে যদি কিছু থাকে তবে অবশ্যই আবার আমাদের দেখা হবে।'

তিনদিন ধরে ক্যাম্প আগলে রেখে গোলাবারুদের অভাবে যশবন্ত আত্মহত্যা করে। যশবন্ত-এর দেহ আঁকড়ে থাকা অবস্থায় চিনাদের ছোড়া গ্রেনেডে মৃত্যু হয় সেলার। চীনা সৈন্যরা যখন বাঙ্কারে প্রবেশ করে তখন যশবন্ত ও সেলা গভীর আলিঙ্গনে চিরনিদ্রায় শায়িত। নুরাকে চীনা সেনারা উঠিয়ে নিয়ে যায় এবং ওঁর আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি।

বিশ্বের সামরিক ইতিহাসে এই ঘটনা স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। যেখানে একজন মাত্র ভারতীয় সেনা,দুই বীর ভারতীয় কন্যার সাহায্যে ৩০০ জন চীনা সৈন্যকে খতম করে, ১৭ নভেম্বর ১৯৬২ শহীদ হন। এই যুদ্ধের পরে চিনা সেনাদের চোখ খুলে যায়। ভীত সন্ত্রস্ত চিনা সেনা যশবন্ত-এর কাটামুন্ডু নিয়ে দেশে ফিরে যায়। যদিও পরে যথোপযুক্ত সামরিক মর্যাদায় ভারতের হাতে তা প্রত্যার্পণ করা হয়।

অরুণাচল ভ্রমণে গেলে অবশ্যই যশবন্ত গড়, সেলা পাস, সেলা লেক, নুরানাং জলপ্রপাত দর্শন করবেন এবং দু ফোঁটা চোখের জল ফেলবেন আমার আপনার ঘরের মৃত্যুঞ্জয়ী তিন সন্তানের জন্য।

গান্ধারী

শতপুত্রের জননী তবু নিঃস্ব এক নারী

শাঁওলি দে

অহল্যা, তারা, মন্দোদরী, কুন্তী, দ্রৌপদী— এই পাঁচজন নারীকে পুরাণে বলা হয় পঞ্চকন্যা, যাদের নাম প্রাতঃকালে স্মরণীয়। অথচ এই পাঁচজনের চরিত্র আলোচনা করলে অনেক সম্পর্ক স্থাপনের তথ্য বা কাহিনি জানতে পারা যায়। তবু এঁরা স্মরণীয়, অথচ কী এক অদ্ভুত অজানা কারণে গান্ধারীর মতো সতীর চরিত্রটি ঢাকা পড়ে যায় অন্ধকারে কিছুতেই তার হিসেব মেলে না।

মহাভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র গান্ধারী, গান্ধাররাজ সুবল যার পিতা, হস্তিনাপুর সম্রাট ধৃতরাষ্ট্র যার স্বামী এবং শকুনি ভ্রাতা। ভীষ্ম বিদুরের সঙ্গে পরামর্শ করে অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে তাঁর বিবাহ স্থির করলেন। যে মুহূর্তে তিনি খবর পেলেন তাঁর হবু স্বামী জন্মান্ধ, অন্ধ পতিকে অতিক্রম করবেন না বলে পতিব্রতা গান্ধারী এক টুকরো সাদা কাপড় নিজের চোখে বেঁধে রাখলেন আজীবনের জন্য।

এইখানে আবার কারও কারও দ্বিমত নজরে আসে। কেউ কেউ মনে করেন ভীষ্ম এক জন্মান্ধ রাজার সঙ্গে তাঁর বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করেন বলে তিনি ভীষ্মের প্রতি প্রতিবাদ স্বরূপ চোখে কাপড় বেঁধেছিলেন। এই ঘটনাই যে পরোক্ষভাবে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কারণ এটাই গবেষকরা মনে করেন। প্রথম দিন থেকেই গান্ধারীর ভ্রাতা শকুনি এই অবিচার মেনে নিতে পারেনি, পারার কথাও ছিল না।

প্রবল বলশালী হওয়া স্বত্তেও জন্মান্ধতার কারণে ধৃতরাষ্ট্রের ভাই পাণ্ডু প্রথমে রাজা হয়েছিলেন। ঈর্ষার কারণ ছিল সেটাও। পাণ্ডুর দুই স্ত্রী কুন্তী ও মাদ্রী। কুন্তী এবং গান্ধারী দুজনেই গর্ভবতী হলেও দু'বছর পরও গান্ধারীর কোনো সন্তান হল না। ইতিমধ্যে কুন্তীর এক সন্তান জন্মালো, নাম যুধিষ্ঠির। গান্ধারী প্রচন্ড রেগে গেলেন এবং প্রবল হিংসার বশে নিজেই নিজের গর্ভপাত করলেন। সন্তানের বদলে ভূমিষ্ঠ হল লোহার মতো কঠিন এক মাংসপিন্ড। প্রবল রাগে তিনি সেই মাংসপিন্ড ফেলেই দিচ্ছিলেন, তখনই ব্যাসদেব এসে উপস্থিত হন। প্রসঙ্গত জানাই, ব্যাসদেবই গান্ধারীকে শতপুত্রের মা হওয়ার বর দিয়েছিলেন। ব্যাসদেবের পরামর্শমত গান্ধারী ওই মাংসপিন্ডটিকে শীতল জলে ভিজিয়ে রাখলেন, তৈরি হল একশটি ভ্রূণ। প্রত্যেকটি ভ্রূণকে তিনি একেকটি ঘিয়ের কলসে রাখলেন। এক বছর পর সেই কলসের একটি ভ্রূণ থেকে জন্ম নিল দুর্যোধন, পরবর্তী একমাসের মধ্যে আরও নিরানব্বই জন সন্তান ভূমিষ্ঠ হল।

এটা ঠিকই যে গান্ধারীর সন্তান সংখ্যা একশ, তারমধ্যে কন্যা সন্তান একজন, দুঃশলা, নিরানব্বই জন ছেলে।

ধৃতরাষ্ট্রের আরেক সন্তান যুযুৎসু এক বৈশ্যা গর্ভজাত। সুতরাং গান্ধারীকে শতপুত্রের জননী বলা হলেও আদতে তা সত্য নয়।

এতজন সন্তানের গর্বিত জননী হওয়ার কথা থাকলেও গান্ধারীর মতো নিঃস্ব আর কেউ ছিল বলে মনে হয় না। পুত্র স্নেহে অন্ধ ছিলেন ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী কিন্তু সন্তান সুখের মুখ দেখেন নি। সময়ের দাবিতে দুর্যোধনসহ অন্যান্য ভায়েরা হয়ে উঠেছিলেন নিষ্ঠুর, প্রবল ঈর্ষাপরায়ণ এবং অহংকারী।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে একে একে তিনি হারিয়েছেন প্রায় সব সন্তানকে। শোকে তখন তিনি পাথর। মরিয়া হয়ে উঠলেন দুর্যোধনকে বাঁচাতে। খবর পাঠালেন সম্পূর্ণ বস্ত্রহীন অবস্থায় ওর সামনে এসে দাঁড়াতে হবে দুর্যোধনকে। চোখ বাঁধার পর সেই প্রথম একবারের জন্য কাপড়ের বাঁধন খুলবেন তিনি। চোখ থেকে বের হওয়া জ্যোতি দিয়ে মুড়ে দেবেন একমাত্র জীবিত পুত্রকে, পরিয়ে দেবেন অমরত্বের বর্ম। কিন্তু সেখানেও বাধ সাধলেন শ্রীকৃষ্ণ। ছল করে বোঝালেন দুর্যোধনকে, ফলস্বরূপ গোপন অঙ্গ ঢেকে মায়ের সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। ভীমের হাত থেকে বাঁচাতে পারলেন না ছেলেকে, ঊরুভঙ্গ অবস্থায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল দুর্যোধন।

কেউ বাঁচল না, কুরুক্ষেত্রের যে যুদ্ধের বীজ গান্ধারীর বিয়ের সময় বপন করা হয়েছিল তা যেন শেষ হল গান্ধারীর জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যুতে। যুদ্ধশেষে স্বামী, কুন্তী সহযোগে তিনি চলে যান বাণপ্রস্থে।

রাজার কন্যা হয়েও ভাগ্যের প্ররোচনায় তাঁর প্রথমে রাণী হওয়া হল না, পরে সেই সম্মান পেলেও পান্ডব ও কৌরব দ্বন্দ্বে মানসিক শান্তি ছিল না গান্ধারীর। গান্ধারী চরিত্রের খারাপ দিক হল অন্ধ পুত্র স্নেহ, যার ফলে অহংকারী ছেলেদের শাসনে বাঁধতে পারেননি তিনি। এমনকি ভরা রাজপ্রাসাদে দুঃশাসন যখন দ্রৌপদীকে লাঞ্ছনা করে, নারী হয়েও চুপ ছিলেন তিনি। কোনও কোনও জায়গায় তিনি পুত্রদের তিরস্কার করেছেন একথা ঠিক, কিন্তু অন্ধ পুত্র শোক সবকিছুকে ছাপিয়ে গেছে। ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে মতের অমিল হওয়া স্বত্তেও প্রকৃত সতী ও ধর্মপরায়না স্ত্রীর মতো স্বামীর মতকেই গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন।

তিনি কুন্তীর প্রতি ছিলেন ঈর্ষাপরায়ণা, রাণী হওয়ার পর কুন্তীকে শিবপুজো থেকে বিরত থাকতে বলেছিলেন রাগে, ক্রোধে। তিনি কুন্তীকে বলে উঠেছিলেন ,"রাজার গৃহিণী আমি রাজার জননী/ কোন ভরসায় তুমি পূজ শূলপানি।।"

নারী হিসেবে তেজস্বী ছিলেন সন্দেহ নেই। যে নারী স্বামী অন্ধত্বের জন্য সারাজীবন আলো না দেখার সিদ্ধান্ত নেয় তাঁর মানসিক জোর নিয়ে সন্দেহ করা চলে না। তবুও তিনি ব্যর্থ। শত সন্তানের জননী হয়েও নিঃস্ব, রিক্ত এক নারী, যার যুদ্ধ শেষে শুধু পুত্রশোকই ভাগে পড়ে। এই এত বড় শোকের পরও হয়ত ছেলেদের পাপের কারণেই গান্ধারী কোনও ট্র্যাজিক চরিত্র হয়ে উঠতে পারে না। দিনের শেষে আমরা গান্ধারীর গুণগান করার কোনও বিষয় খুঁজে পাই না।

বড় গল্প

রাজন্যা

সুচন্দ্রা ভট্টাচার্য

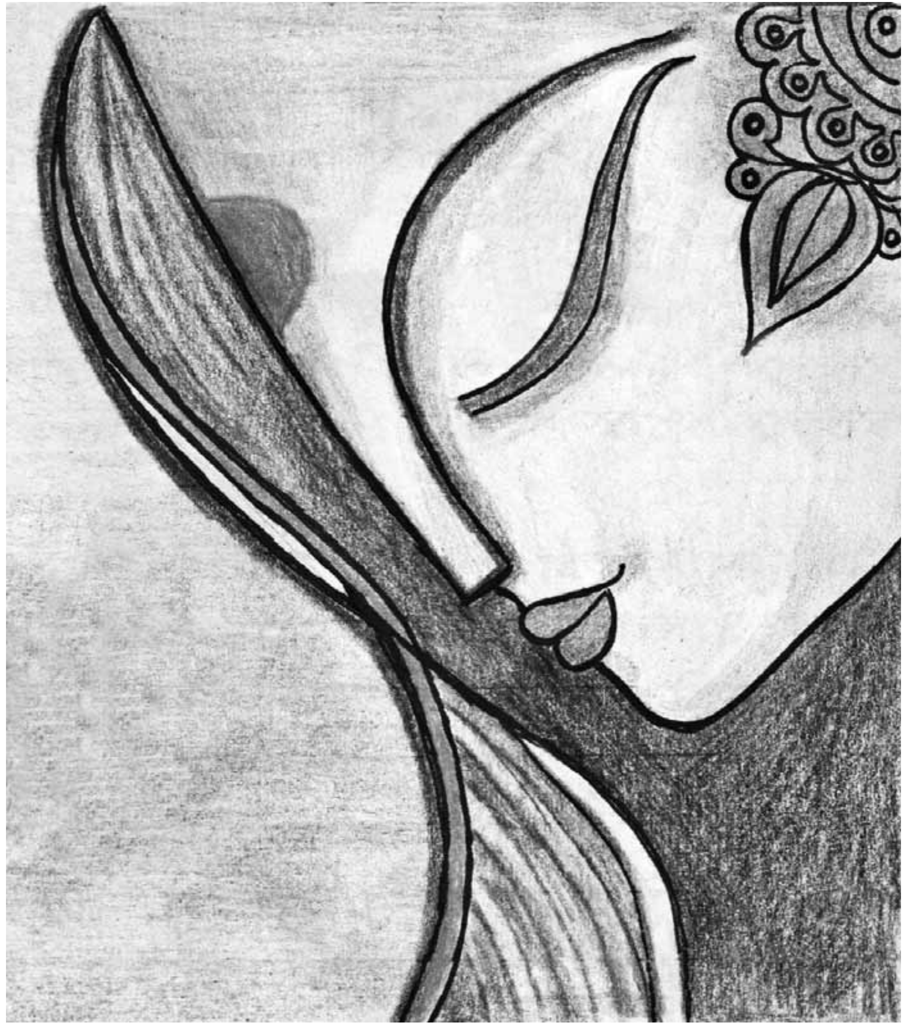

১।

উনুনে কাঠ ঠেলে দিয়ে গাদাখানেক পেঁয়াজ রসুন নিয়ে বসল গেন্দি। লালির আবদারে আজ শুঁটকি মাছের সালুন রান্না হবে। আর লালির জন্য রান্না মানে ভুলকির প্রত্যেকের পাতেই সে ব্যঞ্জন।

তবে মানুষ খুব বেশি নয়। লালির তিন বাজনদার নিয়ামত আনোয়ার সেলিম বুড়ো দাদাসা', দুই দ্বাররক্ষী গগন আর বুধু, লালি জিরা আর গেন্দি মিলে জনাদশেক। শুঁটকি রাঁধতে পেঁয়াজ রসুন একটু বেশি লাগে। হাঁড়িতে ভাত তুলেছে গেন্দি। ফুটতে ফুটতে হাতের কাজ হয়ে যাবে।

কয়েক মাস আগে যখন রাজপেয়াদা গেন্দি আর জিরাকে দাসীর কাজে লাগিয়ে এই পোড়া বাড়িতে নির্বাসন দিয়ে গেল, কপাল থাবড়ে কেঁদেকেটে একসা হয়েছিল গেন্দি। মাঝবয়সে এসে বিধর্মী বেবুশ্যের দাসীগিরি করে নরকের পথ পাকা করতে হবে ভেবে আধবেলা কপাল কুটেছিল সে। তবে জিরার মন অনেক শক্ত। সখীকে বুঝিয়েছিল গ্রামে ভোটের ভয়ে মরতে মরতে বাঁচার চেয়ে বরং এই ব্যবস্থা ভাল। মাইনেকড়িও মিলবে, যখন তখন ভোটের সেনার অত্যাচারও সইতে হবে না। জাতের চেয়ে প্রাণ অনেক বেশি মায়ার।

জিরা আর গেন্দি পড়শি এবং প্রাণান্ত সঙ্গী। দুজনেই ছোটখাটো কালোকুলো গড়পড়তা চেহারা, অভাব আর দুঃখের সঙ্গে ঘর করলেও যথেষ্ট করিতকর্মা। মাত্র দু'দিনেই তাদের হাতের গুণে ভুলকাভুলকির মতন ভুতুড়ে বাড়িখানা একেবারে ঝকঝকে তকতকে। আট দশখানা ঘর আলাদা আলাদা করে শোবার খাবার জিরোবার রাঁধবার নাইবার জন্য তৈরি। পেয়াদারা যথেষ্ট হাটবাজার করে দিয়েছিল, কিচ্ছুটির অভাব হয়নি। বহুদিন পর জিরা আর গেন্দির এলেমে ভুলকাভুলকির পরিত্যক্ত অলিন্দে বাতি জ্বলতে দেখা গিয়েছিল।

কথা ছিল দু'দিন বাদেই বাঈজি তার দলবল নিয়ে আসবে। সেই মত তৈরিও ছিল দু'জন, কিন্তু নির্দিষ্ট দিন পেরিয়ে গেলেও ভুলকি নীরব পড়ে রইল, কেউ এল না।

ঘটনাটা ঘটল পরের দিন।

ভুলকির খিড়কি দালানের পিছনে একটি জঙ্গলঘেরা ঘাটবাঁধানো দিঘি আছে, লোকে বলে ভোলার দিঘি। তার জল বেজায় পরিষ্কার। চান কাপড়কাচা তো বটেই, কুঁজোয় তুলে থিতিয়ে নিলে সে জল দিব্যি খাওয়াও চলে। সকালে গেন্দি দিঘিতে চান করে খাবার জল তুলে এনে উনুন ধরিয়ে ভাবছে আজকেও তারা আসবে কিনা, ক'জনের আন্দাজ রান্না চড়াবে, এমন সময় সদর দরজায় হাঁকডাক শোনা গেল।

এ মহলের আশপাশে বহুদূর অবধি কোনও বসতি নেই, কেবল আদিগন্ত মাঠ। অনেকটা দূরে একটি ছোট বাজার আছে, সেখান থেকে গ্রামের শুরু। কাজেই এদিকটায় লোকজনের যাতায়াত নেই। গেন্দি বুঝল, এ হাঁকডাক অতিথি আগমনের।

উনুন ফেলে তড়িঘড়ি জিরাকে খুঁজল গেন্দি। জিরা কাছে থাকলে বুকে বল হয়। না জানি কোন রাজাকারের দল এসেছে, কেমন বা তাদের চালচলন। কিন্তু চানের আগে তামাক টেনে হাগতে যাবার অভ্যেস জিরার। সে নিশ্চয়ই এখন ভোলার জঙ্গলে। অগত্যা গেন্দি একাই ভয়ে ভয়ে সদরের দিকে এগিয়ে গেল।

দরজা হাট। দুটো মুশকো জোয়ান গগনের সঙ্গে কথা বলছে। বুধু বল্লম হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পথের ওপর সাজানো গোছানো তিনখানা গরুর গাড়ি। গেন্দি আরও এগিয়ে দরজার পাল্লায় পিঠ পেতে দাঁড়াল।

এক মুশকো হাঁক দিল, নামো রে—

সঙ্গে সঙ্গে প্রথম গাড়ি থেকে নামল এক শুঁটকো চিমড়ে লোক, তারপর একটি ছোকরার কাঁধে ভর দিয়ে নামল নড়বড়ে বুড়ো। এদের প্রত্যেকের গালে থুতনিতে দাড়ি, পরণে চোঙা পাজামা আর ঝলমলে আচকান। কারোর মাথায় টুপি, কারোর ঝাঁকড়া চুল।

গেন্দির এসবে আগ্রহ নেই। তার কৌতুহল বাইজি নামে মহিলাটি কখন নামে। লোকগুলো আরেকটি গাড়ি থেকে প্রচুর বাক্স প্যাঁটরা আর বোঁচকা বাঁধা অদ্ভুত অদ্ভুত বাদ্যযন্ত্র নামাল। গেন্দির বুকে ঢেঁকির পাড়! এইবার ধুমসি গিদালী নেমেই হুকুম করবে, যা গোস্ত আর বিরিয়ানি নিয়ে আয় খাব।

কিন্তু গেন্দিকে বুরবক বানিয়ে দিয়ে তৃতীয় গাড়ির ছইয়ের রেশমি পর্দা সরিয়ে নেমে এল একটি পনেরো যোল বছরের তরুণী। মানুষ যে অত সুন্দর হয়, গেন্দির জানা ছিল না। টকটকে রং, ঝকঝকে গড়ন, তরতরে চোখমুখ, ঢলঢলে বুকের ওপর চিকমিক ওড়না, কোমর থেকে পা অবধি স্বচ্ছ ঘাগরা, যেন স্বর্গের অপ্সরী। মাটিতে নেমেই তরুণীটি রাশি রাশি কাচের চুড়ি ঝিনঝিন বাজিয়ে পোশাক ঝেড়ে ওড়না দিয়ে মাথায় ঘোমটা তুলল।

লোকগুলো জিনিসপত্র নিয়ে ভিতরে ঢুকেছে, গগন তাদের ঘর দেখিয়ে দিচ্ছে, গেন্দি ঠায় দাঁড়িয়ে রইল।

বুধু ধড়াম করে সদর দরজা বন্ধ করতেই জিরার গলা পাওয়া গেল, গেন্দি! অ গেন্দি!

এবারে গেন্দির হুঁশ ফিরেছে। সে তাড়াতাড়ি ভিতরে

ঢুকেই দেখল জিরাও কেমন যেন হাঁ হয়ে গিয়েছে।

তরুণীটি ঘরে চলে যেতেই জিরাকে টেনে ধরল গেন্দি, দ্যাওনি পেত্তানি না তো রে বাই?

কী জানি! জিরার গলায়ও সংশয়।

আপন মনে গেন্দি বলে উঠল, আমি জানি। দিনে অমন চেংড়ি হয়া আছে, আত্তি হইলেই আসল চেহারা বাইরাবে।

দু'জনেই নিশ্চিত হল বাইয়ের এ চেহারা আসল নয়, দিন ফুরোলেই তাদের কপালে অনেক দুর্ভোগ আছে।

কিন্তু দিন গিয়ে রাত এল, বরাদ্দের কাজকর্ম সবই ফুরোল, তরুণীর চেহারার বদল হল না। বরং শুতে যাওয়ার আগে যখন দুই সখী টেমি জ্বালিয়ে পানতামাক নিয়ে নিজেদের ঘরে বসেছে তখন পায়ের মল হাতের চুড়ি বাজিয়ে তরুণী তাদের ঘরে এল।

তোমাদের খাওয়া হয়েছে?

গেন্দি চোখ টেরিয়ে দেখল মেঝেতে তরুণীর ছায়া পড়েছে। তবে তো এ পেত্তানি নয়, মানুষই বটে।

তরুণী চৌকির ওপর বসে সুপুরি কাটার কাটারিখানা নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, কী হয়েছে, তোমরা এমন করে কী দেখছ?

জিরার মনে পড়ল ভূতে লোহা ছোঁয় না। তার মানে এ ভূত নয়, মানুষ। সে সাহস করে বলল, তোমার নাম কী?

লালবাঈ। আম্মা ডাকে লালি।

জিরাকে কথা বলতে দেখে গেন্দি ভীষণ নিশ্চিন্ত হয়ে বলল, তোমার ঘর কোনখানে?

ঘরের কথায় লালি উদাসমুখে জবাব দিল, ফারহাবাগে। মুর্শিদাবাদ চেনো?

গেন্দি কান্তাপুরই গোটা চেনে না তার মুর্শিদাবাদ। বলল, অনেক দূর না?

জী।

এইখানে আসলা যে?

আম্মা পাঠিয়ে দিল। তোমাদের রাজাবাবু গান শুনবে।

দেখতে দেখতে আলাপ সহজ হয়ে গেল। জিরা বলল, তুমি গান কও?

গান করি, নাচ করি। গানটাই বেশি করি।

আম্মাকে ছাইড়ে আসলা, ভয় করল না?

ভয় কেন, মুক্তাহারের মতন দাঁত মেলে হাসল লালি, সেলিম চাচা আনোয়ার চাচা নিয়ামত চাচা দাদাসা' সবাই আছে না?

ওই যারা আসছে তারা তোমার চাচা হয়?

জী।

আর বুড়াটা দাদু?

তোমরা এখন ঘুমোবে না?

হ্যা। তুমিও ঘুমাও গিয়া।

রাতে আমার ঘুম আসে না।

জিরা আর গেন্দি একসঙ্গে চোখাচোখি করল। ভয়টা আবার ফিরে এসেছে। পেত্তনি জিন পরী রাতের অন্ধকারেই ঘুরে বেড়ায় আর মানুষের ঘাড় মটকে রক্ত খায়।

আমি যাই— বলেই হঠাৎ লালি উঠে চলে গেল।

লালি চলে যেতেই পড়িমরি করে দোর এঁটে মোটা কাঠের ডাঁশা চাপিয়ে দিল জিরা। গেন্দি কয়েকবার জয় ভবানী, জয় মদনমোহন জপ করে বলল, টেমিটা নিভাইস না রে বাই, জলুক।

শুঁটকি মাছের গন্ধে ম'ম করছে চারদিক। জবরদস্ত চচ্চড়িখানা নামাতে নামাতে নিজের মনেই হেসে মরে গেন্দি। কত ভয়ই পেয়েছিল সেদিন আর আজ কিনা লালি তাদের আদরের নাতিন, তারা লালির নানি আর দিদা।

হাত মুছে পাকঘরের দাওয়ায় বেরিয়ে গেন্দি দেখল দর্জি এসেছে। লালির জন্য নতুন পোশাকের মাপ নেবে।

লালির সঙ্গে সঙ্গে জিরাও এসে বারান্দায় দাঁড়াল। দর্জি ছোঁড়াকে সে খুব চেনে। ভবানীগঞ্জ বাজারের যে গুদামে জিরার বর মুনিশ খাটত তার পাশেই এই ছেলের বাপ মুশারফ কারিগরের দোকান। বাপের যেমন রাজ্যজোড়া সুখ্যাতি, ব্যাটার চরিত্রের তেমনই ছিছিক্কার।

মাপ নেবার ছুতোয় লালির গায়ে এখানে ওখানে হাত রাখতেই জিরা খেঁকিয়ে উঠল, মাত্রা ছাড়াইস না আলতাব, সদ্দারের কানে দিলে কিন্তু তোর সবকয়টা নঙ্গুল কাটা পড়বে কইলাম।

আলতাব চলে গেলে লালি ম্লান মুখে বলল, কেন ওসব বলতে গেলে নানী?

লালির চুলে বিলি কাটতে কাটতে জিরা সস্নেহে বলল, ইজ্জত গেলে চেংড়ি মানসির আর কিছু থাকে না মাও।

লালি মনে মনে ভাবে, ভাগ্যিস এরা মুজরো দেখেনি। সে সামান্য হেসে বলল, অত রাগ দেখালে মরদ জাত কাছেই আসবে না।

রেগে যায় জিরা, দরকার নাই কাছে আসার। মরদের গায়ে বেশি ঢলাঢলি করলে তাকে বাজারু বলে।

বিরক্ত হয় লালি। কী সব মানসিকতা! রূপসী যুবতী দেখে পুরুষ যদি বল্লাই না খোওয়াল তবে সে রূপ যৌবনের দাম আছে? ছোটবেলা থেকে লালিকে শেখানো হয়েছে কীভাবে ভ্রূ নাচিয়ে বুক কোমর এগিয়ে পুরুষের নোলা ঝরাতে হয়। যেদিন তার নাচের চক্করে কোনও মরদ ঘাঘরা টেনে ধরবার জন্য হামাগুড়ি দেবে না, যেদিন তার ঠুংরির গিটকিরিতে পায়ের সামনে মোহরের থলি পড়বে না সেদিন তো সাক্ষাত মৃত্যু। রূপের আগুনে ঝাঁপ দেওয়া পতঙ্গেরা রূপসীর গর্ব, তাদের দূরে সরিয়ে দিতে আছে? লালির নানি এদেরই বয়সী অথচ এখনও আতরজানের নাম শুনে আমীর ওমরাহদের চোখে নেশা ধরে। জংলি দেশের বুড়ি কামিন কী বুঝবে তার মর্ম!

চুলের আদরে ঝিমোচ্ছিল লালি। দ্বাররক্ষী বুধু এসে খবর দিল রাজার পেয়াদা এসেছে।

জিরা একটু অবাক হল। এই তো গত পরশু লালি গিয়ে রাজাহুজুরের আনন্দাবাসের একটা রাত রঙিন করে দিয়ে এল। জিরা গেন্দি লালির বখশিসের বখরাও পেল, আবার তলব?

ও বড়ি রানীমার আদমি আছে।

বুধুর এই কথাটা শুনেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠে জিরা লালিকে একটানে ঘরের ভিতর ঢুকিয়ে বাইরে থেকে দরজা টেনে কুন্ডি লাগিয়ে দিল। গেন্দির মুখেচোখে ভয়। মহারানীর পেয়াদা মানেই লালির ক্ষতির আশঙ্কা। দুই দাসী বারান্দায় দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল।

আমার নাম গুণধর। রাজবাড়ি থাকি আসচি। ডাঙরআঈ দেবতী কতলা খবর নিতে পাঠায়েছেন।

রাজপেয়াদা হলেও লোকটি তেমন জাঁদরেল নয়, কথাবার্তারও ঠিক স্থানীয় লোকদের মতন নয়। একটু যেন বোকাসোকা হাবাগোবা গোছের। একনজর তাকে জরিপ করেই জিরার হিম্মত বেড়ে গেল। সে গলা খাঁকরে বলল, তোদের রানীমা কয়দিন পরপর প্যায়াদা পাঠায় ক্যান রে?

হাতের লাঠি পাশে রেখে বারান্দার ধারে বসল গুণধর, কই। আমি তো আজকাই অসলোং।

না, এর আগেও একজন আসচিলো। সদর দরজার থাকি খোজখবর নিয়া গেছে। আমরা বাদে শুনচি।

মাথা চুলকোয় গুণধর, কী জানি। লখা হবে তাইলে।

লখাটা আবার কেটা?

ছোটআঈ দেবতীর লোক।

দুই রানীয়ে দুই প্যায়াদা পাঠাইচে। কাউটাল লাগছে নাকি রে?

গুণধর প্রমাদ গুণল। এরা যেমন জাঁহাবাজ মেয়েছেলে তাতে খবর কিনতে এসে বেচতে না হয়। চাঁপা তাকে কী ফ্যাসাদেই না ফেলেছে। যা হোক কিছু খবর যোগার করে ভাগারাম দেওয়াই ভাল।

গলায় তোয়াজ ভরে গুণধর বলল, বাইজির খবর কিছু দ্যাওনা মাসি, খালি হাতে গেলে যে আমার মুড়াখান আর থাইকবে না।

সুযোগ বুঝে রসিয়ে একখানা গপ্পো ফাঁদল জিরা। রাজার পেয়াদা তাদেরকে ম্লেচ্ছের সঙ্গে ঘর করিয়েছে, এবার ঝুটমুট খবর দিয়ে পেয়াদা মরুক।

শোনরে বাপ, জিরা বলল, ও হচ্ছে নবাবের জেনানা। নবাবের তো অনেক বউ, যেইটা একটু গানটান জানে সেইটাকে আমাদের রাজাহুজুরের কাছে বেচছে। কোথাকার মেয়ে জানিস, অনেক দূরের দেশ, ফারাবাঘ।

চোখ গোল্লা হয়ে গেল গুণধরের, ছচা মাসি?

ছচা মানে? এক্কেরে টুস্‌টুসা পাকা খবর। রাজাহুজুর তো এমন খুশি, বেটিকে সব দিবার লাগচে। আসার পথে যে বাজারখান দেখলি সেইটা, এই মহল্লাটা সব ওই বেটির। এখন তো রাজাহুজুর তার সঙ্গে এক পাতেও খায়।

জিরার চালাকি বুঝে ফেলছে গেন্দি। যে গুণধরের কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, মদ আর গোস্ত।

গুণধর লাঠিখানা বাগিয়ে উঠে দাঁড়াল, একবার ডাকো না মাসি, দেইখে চোখে আরাম নেই।

গা রি রি করে উঠল জিরার। দাঁতে দাঁত কষে বলল, আরাম হবে না রে বলদা, দেখলে কানা হবি। এক পসুন জুই বুঝলি, সে হচ্ছে আগুনের খাপরা।

গেন্দি ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, তাছাড়া সে কি এইখানে থাকে? তার দলে লোকজন থাকে। সে থাকে রাজাহুজুরের রংতামাশার মহল্লায়। রোজ একবার চান পাইখানার জন্য আসে, বাস। একটু আগেই চইলে গেল। তুই না হয় ওইখানেই গিয়া দেখগা।

যথেষ্ঠ খবর পাওয়া গেছে, গুণধর হাঁটা দিল। খেয়েদেয়ে কাজ নেই, রাজার সহচরীর পিছনে ধাওয়া করে মুন্ডুটা খোওয়ায় আর কি! যত্তোসব।

গুণধর চলে যেতেই সদর দরজা বন্ধ করে হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ল জিরা আর গেন্দি।

২।

মহারাজ উপেন্দ্রর দুই রানীর মহল আলাদা। কিছুদিন ধরে মহারানী খেয়াল করছিলেন মহারাজ তাঁর মহলে আসছেন না। তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধরে নিয়েছিলেন ছোটরানীর ভাগ্য খুলেছে। মনে মনে সতীনের যৌবনকে যমের বাড়ি পাঠিয়ে তিনি নিজের মহলে মনমরা হয়ে বসেছিলেন।

কিন্তু যেদিন তিনি শুনলেন মহারাজ দরবারেও নিয়মিত বসছেন না, তখন তিনি গোপনে দূতী পাঠিয়ে ছোটরানীর মহলে খোঁজ নিলেন। দূতী খবর আনল মহারাজ বহুদিন সেখানেও পা রাখেননি এমনকি তিনি নিজের মহলেও খুব একটা থাকেন না। এইবার মহারানী বুঝলেন অঘটন কিছু একটা ঘটেছে।

কথায় বলে, বিপদ নাকি পরে জানে আগে/ ঘরে

জানে বাদে। মহারানীকে হুকুম করতে হল না, তাঁর উপকারী দূতী আবার খোঁজ করে এসে জানাল, প্রাসাদের সামান্য দূরে আনন্দাবাস নামে যে রংমহল আছে সেটিই নাকি আপাতত মহারাজের স্থায়ী ঠিকানা।

মহারানী মৎস্য রাজকন্যা। শ্যামলা রং, দীর্ঘ গড়ন, বয়স চল্লিশের নিচে হলেও রাজকন্যা এবং মহারানী হবার দম্ভে তাঁর মুখেচোখে কাঠিন্য আর বয়সের ছাপ স্পষ্ট। এছাড়াও তাঁর চালচলন ও মানসিকতায় রাজকীয়তার ভারি অভাব। রাতদিন অন্তঃপুরের দাসীদের সঙ্গে সময় কাটানোর ফলে মুখের ভাষা এবং মেজাজও অমার্জিত। দূতীর কাছে এ হেন দুঃসংবাদ পেয়ে তাঁর সবক'টি অপগুণ একসঙ্গে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। তিনি ঠিক করলেন মহামন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে বিষয়টি নিয়ে কেলেঙ্কারী বাধাবেন।

কিন্তু বাধা দিল তাঁর দূতী। সে মহারানীকে বোঝাল, ঘরে মাগ রেখে স্বামী জারের কাছে রাত কাটাচ্ছে এ খবর চাউর হয়েই গেছে, কিন্তু তাই নিয়ে মহারানী ঝামেলা পাকিয়েছে একথা জানাজানি হলে মহারানীর মানইজ্জত ধুলো চাটবে। বরং একজন পেয়াদা নিয়োগ করে ওই জারের নাড়িভুঁড়ি টেনে বের করা যাক, দরকারে সেই খবর ভাঙিয়ে তাকে তাড়ানো যাবে।

কয়েকদিন পর এক সকালে মহারানী স্নান পূজাপাঠ সেরে প্রসাধন করতে বসেছেন। মুগার পাটানি, রূপটান আর সুগন্ধি নিয়ে মালিন তাঁকে সাজিয়ে দিচ্ছে, মালিনের হাতের গুণে ধীরে ধীরে সেজে উঠছে এক দেবীপ্রতিমা, এমন সময় বলা নেই কওয়া নেই অনুমতির বালাই নেই, হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢুকে পিঠ চেপে দরজা বন্ধ করে হাঁফাতে লাগল মহারানীর দূতী চাঁপা।

চাঁপার বয়স মহারানীর চেয়ে অনেক কম। ছিপছিপে গড়ন, ঘোর কালো তেলতেলে গায়ের রং, কাটা কাটা ধূর্ত চোখমুখ, যেন স্ত্রী রূপী ভুজঙ্গনা। দম স্বাভাবিক হলে সে মালিনের সামনে এসে বলল, তুই যা। আমি পরায় দিতেছি।

মালিন তখন সবে মহারানীর গায়ে পাটানি জড়িয়েছে। বুকে বগলে কাপড়খানা না গুঁজলে খুলে যাবে, অমনি চলে যায় কী করে। আবার চাঁপার হুকুম না মানলেও নয়। ফাঁপড়ে পড়ল সে।

চাঁপার আরেকটি পরিচয় আছে। সে মহারানীর বাপের দেশের লোক এবং খাস দাসী। এর ফলে সে মহারানী মহলের দাসীপ্রধান। তার হুকুমে কয়েকজন কিঙ্করী মহারানীর সেবা করে, আবার তাদের হুকুম মেনে চলে বাদবাকি দাসীবাঁদীর দল। কাজেই এ মহলে চাঁপার ঠাটবাট সবার ওপরে।

কাপড়খানা খামচে ধরে কটমট করে চাইতেই মালিন বেচারি পালিয়ে বাঁচল। চাঁপা যেন উত্তেজনা আর ধরে রাখতে পারছে না। তাড়াতাড়ি কাপড় গুঁজতে গুঁজতে বলল, গুণধর খবর আনছে।

কে গুণধর?

পালঙ্কের ওপরে রাখা অঙ্গবস্ত্রটি তুলে মহারানীর হাতে দিয়ে চাঁপা বলল, ক্যান আমার পাঠানো প্যায়দা, ভুইলে গেলা?

মহারানীর চোয়াল কঠিন হয়ে গেল। অঙ্গবস্ত্রটি হাতে নিয়ে তিনি আয়নার সামনে দাঁড়ালেন, কথা বললেন না।

রাজাহুজুর ফারাবাঘা না কোন একটা দেশ থিকে গানাআলি আনছে।

কাজলটানা চোখে প্রশ্ন ফুটিয়ে মহারানী বললেন, গানাআলি?

আরে বুজলা না, ওই যে কী বলে, বাই। বাইজি।

বিড়বিড় করে ঠোঁট নাড়লেন মহারানী, বাইজি!

হ্যা গো। সে বেটি মোছলমান। মদমাংস খায়। রাজাহুজুরের পাতেই খায়।

আঁতকে উঠলেন মহারানী। বিশ্বজয়ী সিংহপুরুষের বংশধর ছত্রধারী মহারাজ শেষে কিনা...

সে রাজাহুজুরের সঙ্গেও থাকে আবার তার একখান দালানবাড়িও আছে। নাম শুনবা? ভুলকাভুলকি হি হি!

দাঁত বের করে মহারানীর অঙ্গবস্ত্র কাঁধে তুলে দেবার জন্য হাত বাড়াল চাঁপা। এক ঝটকায় হাতটা সরিয়ে দিয়ে মহারানী বললেন, এই নগরে বেশ্যামাগিদের থাকার চুলা নাই?

চাঁপার অধিকারের পাল্লা অনেক ভারী। সে মুখ ভেংচে বলল, তোমারও যেমন বুদ্ধি। সে কি দুই কড়ির কাপড়তোলা ধাগড়ি যে বেশ্যাপাড়ায় থাকবে? সে হইল নবাবের মেছেলে। যার জমিনে পা রাখবে তার চোদ্দ গুষ্টির কপাল। গানটান জানে তাই আমাদের রাজাহুজুর তাকে কিনছে।

মহারানী স্তম্ভিত! কার মুখ দেখে আজ সকাল হয়েছিল কে জানে।

মহারানীকে টেনে বসাল চাঁপা। সোনারূপার নকশা কাটা একখানি কাঠের মঞ্জুষা খুলে পাঁচলহরী চুনির হার বের করে মহারানীর গলায় পরিয়ে দিয়ে বলল, সে একা আসে নাই। তার সঙ্গে মেলা লোকজন আছে। দাসীবান্দিও আছে।

আয়নায় জোড়া প্রতিবিম্বে চোখ রাখলেন মহারানী, তোর পেয়াদা নিজে চোখে তাকে দেখচে?

একখানা চুনি বসানো কানবালা বের করে চাঁপা বলল, দেখচে মানে? আলফাল লোক পাঠাইচি নাকি? দেখার পর থিকে তো গুণধরের মাথা বিগড়ায় গেছে।

মহারানীর দৃষ্টি ক্রমেই তীক্ষ্ণতর হচ্ছে, ক্যান?

ক্যান আবার, দুলখানা মহারানীর কানের লতিতে বিঁধিয়ে চাঁপা বলল, সে কি তোমার মতন মা শেতলা নাকি? সে হচ্ছে আগুন।

আগুন শুনেই দাউদাউ জ্বলে উঠলেন মহারানী। এক টানে কানবালা খুলে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, বাইর হ'। আমার ঘর থিকে বাইর হ'। আগুনে ঝাপ দিয়া মরগা যাঃ।

ব্যাজার মুখে পালঙ্কের তলে উবু হয়ে পানের বাটা টেনে বের করল চাঁপা, আমার মরা লাগবে না। নগরের বড় বড় লোকের মরা শেষ। তার নাচ দেখতে কারা যায় জানো? মন্ত্রী সান্ত্রী নায়েব বকশি কেউ বাদ নাই। রাজাহুজুর তো আছেই। যে বাজারে ওর চাকর খচ্চা নেয় তারও নাম হইচে লালবাজার।

লালবাজার; মানে?

ওই দ্যাখো, এতক্ষণ তোমাকে নামটাই বলি নাই। তার নাম হচ্ছে লালবাই। ওইজন্য বাজারের ওই নাম। বোঝো মাগির পসার।

বাজারু বেটির নামে বাজার হবে না তো কি মন্দির হবে, বিদ্রুপ করলেন মহারানী, পসরা দেইখে বুক ফাটলে বল তোর নামেও একখান বাজার দেই।

গা মুচড়ে পানের বাটা নিয়ে বসল চাঁপা। সে বাটার এমন নকশা যেন একখানা গয়নার বাক্স।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হতেই চাঁপা উঠে দাঁড়াল। মহারানী তীব্র স্বরে বললেন, বল আমি এখন খাবো না, খিদা নাই।

হুকুম তামিল করে ফিরে এসে দেখল মহারানী অস্থির পায়চারি করছেন।

মোছলমানের সঙ্গে খাইতেছেন শুইতেছেন আবার আমার ঘরেও ঢুকতেছেন, ছিয়া রে ছিয়া। মুখে নুড়া জালাবো আমি দ্যাখ।

সোনার বালা হাতে ঝিকোচ্ছে। কচকচ করে সুপুরি কাটতে কাটতে চাঁপা বলল, নুড়া জালানোর খ্যাম থাকলে তোমার সোয়ামি ঘর ছাড়ার সাহস পায়? হাসায়ো না।

মহারানীর বেলপাকা গাল মুহূর্তেই পানিয়াল! তিনি গর্জে উঠলেন, চাপি! মুখে লাগাম দে।

এই মেজাজের বহর খুব জানা আছে চাঁপার। হম্বিতম্বি যতই থাক চাঁপাকে ছাড়া একদন্ডও চলবে না। একটুও ভয় না পেয়ে পানসুপুরি গালে ঠাসল চাঁপা, রাজাহুজুরের উপরে চোপা করতে পারবা তুমি? রানীর মুটুকখান আসলে তোমার গয়না।

হারের চুনি খুঁটতে খুঁটতে চোখ সরু করলেন মহারানী, পারি কিনা দেখবি?

মহারাজের রিরংসার কয়েকটুকরো ছাপ চাঁপার গায়েও আছে। তবু মহারাজ তার স্বামী নন, সে-ও দাসীর বেশি কিছু নয়। এই সুযোগে নিজের বঞ্চনার ছোট্ট একটা শোধ নিলে কেমন হয়? মহারানীর রাগ উস্কে দিয়ে চাঁপা বলল, কে দেখাবে, তুমি? তাইলেই হইচে।

বেশ, কেটে কেটে উচ্চারণ করলেন মহারানী, দ্যাখ তাইলে আমার মুটুকের খ্যাম। মোছলমানের আইঠা আর আমি ঘরে নিব না। আমার মহল থিকা তোদের রাজাহুজুরকে যদি না তাড়াইচি—

দমে গেল চাঁপা। আয়নার সামনে রাখা মখমলের মোড়কে ছোট্ট হীরের মুকুট। সে দিকে তাকিয়ে ঢোঁক গিলে বলল, থাক। চুপ করো।

শোন চাপি, জোরে জোরে শ্বাস নিতে লাগলেন মহারানী, আজকের থিকে আমার ঘরে, না আমার ঘরে না আমার মহল্লায় তোদের রাজাহুজুরের ঢোকা বন্দ। পতিহারির সঙ্গে তুইও পাহারায় থাকবি। তার ছায়াও যদি এইদিকে পড়ে না—

ধপ করে পালঙ্কে বসে পড়লেন মহারানী। এদিক ওদিক উদ্ভ্রান্ত নজর চালিয়ে বললেন, তাইলে খাড়াধরাকে দিয়া আমি তোর ধড় আর মুড়া আলদা কইরে দিব। মনে রাখিস।

এমনটা হয়ে যাবে চাঁপা ভাবেনি। মহারানীকে রাগিয়ে দিয়ে মহারাজকে ধমক খাওয়াবে এটুকুই তার মতলব ছিল। কিন্তু এ কী হয়ে গেল!

গলায় আদর মেখে চাঁপা বলল, কী সব যে কও না। রাজাহুজুর তোমার সোয়ামি না? ঠান্ডা হও দেখি। জলখাবার আনব? টানা পাখা চালাইতে বলি?

ক্রুর দৃষ্টি ফুটল মহারানীর চোখে, কী বললাম কানে যাই নাই? আমার হুকুম। বড় দেবতীর হুকুম। মহারাজ আর এই মহলে ঢুকবে না।

পান চিবোতে ভুলে গেল চাঁপা। অপরাধীর মতন মাথা নিচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মহারানী তখনও চিৎকার করছেন, আমার হুকুম—

মহারানী কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। চাঁপা দরজাটা ভেজিয়ে খানিকক্ষণ দিশেহারা হয়ে রইল। ইচ্ছে করল গুণধরকে গিয়ে ঠাস ঠাস চড়ায়। তারপর মনে হল ওর কী দোষ, ও যা জেনেছে তাই বলেছে। দোষ তো আসলে চাঁপার। সব কথা মহারানীকে না জানালেই এতটা অশান্তি হতো না। এই হুকুম না মানলে খাঁড়াধরা এক কোপে ঘাড় থেকে মাথা নামিয়ে দেবে।

এখন একটিমাত্র মানুষ এই বিপদ সামাল দিতে পারবে, ছোটরানী। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে তিনি চাঁপাকে মোটেই সহ্য করতে পারেন না। ওপরে ওপরে ভালমানুষি দেখালেও মহিলার মধ্যে চাপা গুমোর আছে। বরং তার

খাস দাসী সনকা মানুষটা ভাল। সনকাকে দিয়েই কথাটা ছোটরানীর কানে তুলতে হবে। চাঁপা যখন অশান্তির জন্য দায়ী কাজেই অশান্তি মেটানোর দায়ও চাঁপার।

হনহনিয়ে ছোটরানীর মহলে ঢুকে গেল চাঁপা। জমজমাট দুপুরে রাজ অন্তঃপুর কর্মব্যস্ত। খানিক আগেই পাশের উঠোনে কতবড় বিপদ এসে দাঁড়িয়েছে কেউ তার খোঁজ রাখে না, রাজবাড়ির এমনই মহিমা।

ছোটরানীর খাসমহলের দাওয়ায় বসে বালিশে তুলো ভরছিল সনকা। চাঁপা তার সামনে গিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল,

সনেকা রে! আউলা লাগচে।

৩।

ভালই কাটছিল লালির দিনরাত। জিরা গেন্দি তাকে যত্ন করে, সেলিম আনোয়ার নিয়ামত বাজনা বাজিয়ে রেয়াজ করায়, মুজরো সাজায়, ভালমন্দ খায় আর ইতিউতি ঘুরে বেড়ায়, দাদাসা' ধর্মের পুঁথিপত্র পাঠ করেন, নামাজ আদা করেন আর যখন তখন ঘুমিয়ে কাটান।

কিন্তু কয়েকদিন হল তিনি বারবার জ্বরে পড়ছেন। কোমরে পিঠে যন্ত্রণা হচ্ছে, পা ভারী হয়ে চলতে ফিরতে কষ্ট। আজীবন জয়পুরের শুকনো আবহাওয়ায় কাটিয়েছেন, ঢাকায় গিয়েছিলেন নবাবের মেহফিলের আমন্ত্রণ রক্ষা করতে। সেখান থেকে মুর্শিদাবাদ এবং কান্তাপুর। নিছক বেড়াতে এসে এই ভ্যাপসা জলবাতাসে তাঁর প্রাণান্ত হচ্ছে। রাজাহুজুরের অনুমতি নিয়ে সরাসরি জয়পুরে খবর পাঠানো হয়েছিল। আজ সকালেই মোহন নামে একটি লোক এসেছে তাঁকে নিয়ে যেতে। আগামীকাল তিনি চলে যাবেন।

গোটা দিন চলে গেল গোছগাছে এবং রাজ সাক্ষাতে। রাত হলে তিনি লালিকে ডেকে বললেন, গাও বেটি। এ জন্মে হয়ত তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না। ক্যায়মত আসার আগে তোমার ফিরদৌসী নাগমা শুনে কলিজা শান্ত করি।

ছলছল চোখে দাদাসা' কে কিছুক্ষণ জড়িয়ে থাকে লালি। তারপর রেয়াজের ঘরে নিয়ে গিয়ে আরামকেদারায় বসিয়ে দেয়। ঘরের মেঝেজোড়া ধপধবে ফরাস পাতা। তার মাঝখানে লালিকে পা মুড়ে বসতে দেখে সেলিম নিয়ামত আনোয়ার যার যার যন্ত্র নিয়ে নিঃসাড়ে লালিকে ঘিরে বসে। জিরা লম্ফ নিয়ে এলে দাদাসা' ইশারায় তা ফিরিয়ে দেন। আকাশে পূর্ণচন্দ্র। রূপো গলা জল গড়িয়ে এসেছে ঘরের চৌকাঠ অবধি। কিছুক্ষণ সব চুপচাপ।

একটু বাদে নীরবতা ভেঙে সারেঙ্গীতে ছড় টানে আনোয়ার। লালি স্পষ্ট গলায় আলাপ ধরে। মান্দ রাগের সুর সেই সুদুর মরুভূমি থেকে যেন দাদাসা'কে ঘরে ফিরিয়ে নেবার জন্য ছুটে আসে। সেলিমের আঙুল কখন তানপুরায় জোয়ারি তুলে ঘর ভরাট করেছে কেউ জানে না। লালির সুরে কথা বসতেই নিয়ামতের শুঁটকো আঙুলগুলি ডুগি তবলার ওপর আশ্চর্য মিঠে বোল জাগায়। মুহূর্তেই চারদিক জন্নত-এ-আলম!

কাহা মান লে ও পাপিহরা রে
না লে পিয়া কা নাম
কাহা মান লে মান লে...

গগন আর বুধু প্রথমদিকে অচেনা বাজনাগুলি দেখে কৌতুহলী হয়ে ধরেছিল, ওস্তাদজি এট্টু বাজায়ে শুনান না। তারপর বাজনা শুনে মুখ বেঁকিয়ে বলেছিল, অ্যাঃ! আমাদের ঢাকের বাজনায় অনেক জোর, এমন ঠং ঠং ডগডগ নাকি? সানাই কাঁসির আওয়াজে অনেক ধার, কাঠিঘষা যন্তরের মতন চ্যাও ম্যাও করে না, গাড়িয়ালের দোতারার সঙ্গে ভাওয়াইয়ার সুরের জব্বর দোস্তি। বাইজির মতন শীতে কাঁপা আ আ ই ই তার কাছে কিচ্ছু না। আজ গগন আর বুধু কেমন যেন বোকা বনে গেল। সবগুলি যন্ত্র একসঙ্গে বেজে উঠে গানের হাত ধরলে এমন ভেল্কিবাজি হতে পারে ওদের ধারণা ছিল না। থাকবে কী করে, কুষাণ বিষহরি আর গোপীচান্দের গান শুনেই সবার কান অভ্যস্ত যে।

দেখতে দেখতে লালির সুরের মায়ায় বন্দী হয়ে গেল ভুলকির সব কয়টি মানুষ, দালানকোঠা, অলিন্দ গবাক্ষ, ওদিকে ভবনের মাথায় হাজার ঝড়ের আলো বিছিয়েছে জোছনা, ভোলার দিঘির জল চাঁদের মুখখানা বুকে ধরে সোহাগ করতে লেগেছে, লালি গেয়ে চলেছে—

মোরি বালি উমরিয়া কো দেখ
মোরি সুনি সাজারিয়া কো দেখ
না উজড় মোরা জান রে—

রাজকন্যা না হলেও সর্ব অর্থেই ছোটরানী রাজন্যা। তিনি শান্তভাবে বললেন, আমাদের স্বামী ভিনদেশ থেকে নর্তকী আনিয়েছেন একথা আমিও শুনেছি। ভেবেছিলাম তোমার সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলব। কিন্তু তার আগেই তুমি এ কী করলে?

লালির গলায় ঢেউ, মওসিকি শুনতে শুনতে দাদাসা'র চোখে জল। দুনিয়ার দওলত জমজমা বেহেশত্ এমনকি খোদাতালা অবধি যেন বরবাদ, সব বরবাদ। পাকঘরে বসে জিরার মনে হল, অচেনা ভাষা-সুরের এ গান যেন মনের ভিতর ঢুকে সব দুঃখ টেনে বের করে। মনে পড়ল ভোটের হাতে লুঠ হয়ে যাওয়া মেয়ের মুখ। গেন্দির বুক খাঁ খাঁ করে উঠল উজড়ে যাওয়া ঘর গেরস্তির জন্য। গগনের মনে হল, পরিবারের মানুষগুলিকে এর ওর হাতে সাহায্য পাঠাচ্ছে, সেসব তারা পাচ্ছে তো। বুধু আদিগন্ত জোছনাধোওয়া নির্জন মাঠের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল তার বহুড়ী এখনও তার পথ চেয়ে দিন গোনে কি...

শোবার আগে গেন্দি লালিকে বলল, এই গান কই শিখলা বিবি?

লালি গম্ভীর হয়ে বলল, আমাকে বিবি বলবে না। বিবি মানে বউ। শোনো। যে নাচগান করে তাকে বলে জান। যে গান গায় তাকে বলে বাই। যে মদ ঢেলে খাওয়ায় সে হচ্ছে কানীজ আর,

জিরা গেন্দি একসঙ্গে বলে, আর?

লালি চোখ টিপে বলে, আর যে কাপড় তোলে সে হল খানগি।

জিভ কেটে হাসতে হাসতে দুই দাসীর দম বেরিয়ে যায়। লালি এ গান কোথায় শিখেছে তা আর জানা হয় না।

৪।

প্রাগজ্যোতিষপুরের মহাপণ্ডিত মুরারিদেব সর্ববিদ্যার একমাত্র কন্যা মহারাজ উপেন্দ্রর ছোটরানী। আকৃতি ও প্রকৃতিতে তিনি মহারানীর ঠিক বিপরীত। ফর্সা গোলগাল বেঁটেখাটো হাসিমুখ মানুষটির আদবকায়দায় শিক্ষা ও পেলবতার আশ্চর্য মিশেল। কুলদেবতার মন্দিরের পাঠকীর্তনে তিনি নিয়মিত শ্রোতা হন, তাঁর পৃষ্ঠপোষণায় গিদালী এসে তাঁকে লোকপুরাণ ও ব্রতপার্বণের পালা শুনিয়ে যায়, মোটের ওপর সৎসঙ্গে তাঁর দিন কাটে। বয়সে তিনি মহারানীর থেকে খানিক ছোট হলেও বুদ্ধি ও প্রজ্ঞায় তিনি ঢের বয়স্য।

মহারাজের পদস্খলনের সংবাদটি অনেক আগেই ছোটরানীর গোচরে এসেছিল। তিনি এ নিয়ে খানিক বিচলিতও ছিলেন কিন্তু আজ মন্দির থেকে ফিরে সনকার মুখে ভয়ঙ্কর সংবাদটি শুনে তিনি এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে তক্ষুণি মহারানীর মহলে ছুটলেন। দাসীরা যথানিয়মে তাঁর পিছু নিয়েছিল, তিনি সবাইকে ক্ষান্ত করলেন। এসব ব্যাপার নিচুস্তরে যত কম পৌঁছায় ততই মঙ্গল।

ভোঁতা নকশাকাটা মস্ত বড় কাঠের দরজার পেট বরাবর ঝুলছে বিচিত্র গড়নের সোনার কড়া। নাড়তে হল না, কড়ায় হাত দিতেই দরজা খুলে গেল। কপালে দুশ্চিন্তার ছাপ নিয়ে ছোটরানী ঢুকলেন মহারানীর কক্ষে। দরজা ভেজিয়ে এগিয়ে গেলেন পালঙ্কের দিকে।

পালঙ্কের ওপর আলুথালু হয়ে পড়ে ছিলেন মহারানী। পাটানি দলা হয়ে হাঁটু অবধি উঠে গেছে, মেঝেতে লুটোচ্ছে অঙ্গবস্ত্র। ছোটরানী নিচু হয়ে সেটি তুলে নিলেন।

চন্দনগন্ধে ভরে উঠেছে চারদিক। মহারানী মাথা তুললেন।

এত বেলায় শুয়ে রয়েছ যে? স্নিগ্ধ স্বরে প্রশ্ন করলেন ছোটরানী।

কোনমতে উঠে বসে বুকে কাপড় বাঁধলেন মহারানী।

কী হয়েছে ডাঙরনী?

খোঁপা ভেঙে পিঠে নেমেছে, চোখের কাজল ধুয়ে নেমেছে গালে, ক্ষীণ স্বরে মহারানী জবাব দিলেন, কই?

রাজকন্যা না হলেও সর্ব অর্থেই ছোটরানী রাজন্যা। তিনি শান্তভাবে বললেন, আমাদের স্বামী ভিনদেশ থেকে নর্তকী আনিয়েছেন একথা আমিও শুনেছি। ভেবেছিলাম তোমার সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলব। কিন্তু তার আগেই তুমি এ কী করলে?

মহারানীর কান খাড়া হল। তাহলে চাঁপা গিয়ে ছোটরানীকে সব কথা লাগায়? আর কী কী হচ্ছে তাঁর পিছনে?

রাগী গলায় তিনি বললেন, যা করছি ঠিক করছি।

না ঠিক করোনি, নরম সুরে শাসন করলেন ছোটরানী, মানছি তোমার কষ্ট হয়েছে। আমারও হয়েছিল। স্বামী অন্যগামী হলে স্ত্রীর মাথা হেঁট হয়। কিন্তু সে কথা কি দাসীর সঙ্গে আলাপ করতে আছে?

ঘর বয়ে জ্ঞান দিতে এসেছে, মনে মনে ছোটরানীকে গাল পেড়ে মহারানী বললেন, দাসী মানে চাঁপা তো? ওর সঙ্গে আলাপ না করলে খবরটা কই পাইতাম, স্বপ্নে?

কেন, গুপ্তচর ছিল, পাটোয়ারী ডাকুয়া ছিল, তুমি সাবধান করলে তারা এ কথা গোপনও রাখত। চাঁপা কেন?

শুকনো মুখে অসূয়া ফুটিয়ে মহারানী বললেন, তুই কি চাপির নামে কুচ্ছা কত্তে আসছিস?

যথেষ্ট অপমান, তবু মেজাজ ধরে রাখলেন ছোটরানী, তুমি হলে ডাঙ্গর দেবতী, পাটরানী। মহারাজার পরেই তোমার ক্ষমতা। তোমার কি একজন দাসীকে দিয়ে মহারাজকে শায়েস্তা করা চলে? মহারাজেরও তো একটা মানসম্মান আছে।

একপলক ছোটরানীর দিকে চেয়ে রইলেন মহারানী। ফর্সা গোল মুখের চারদিকে নেমেছে ঝুরো ঝুরো চুল।

লক্ষ্মীমন্ত চেহারা আরও খোলতাই হয়েছে লালপেড়ে ঘিয়ে রঙের মেখলায়। চন্দন তিলকে, অলঙ্কারে তাকে দেখতে লাগছে যেন সাক্ষাৎ ভবানী।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মহারানী বললেন, যার যা পাওনা।

অবুঝ হয়ো না ডাঙরানী। তুমি কি ভাবছ অপমান করে মহারাজকে তাড়িয়ে দিলেই সমস্যা মিটবে? বরং লোক জানাজানি হবার আগে চল একটা উপায় খুঁজি। দুজনে মিলে তাঁকে বোঝালে তিনি নিশ্চয়ই বুঝবেন।

সে কি টোলের পড়ুয়া যে তাকে বুঝায় শিখায় দিতে হবে? নিজের বোধ নাই?

হাসলেন ছোটরানী, শুধু টোলে পড়লেই মানুষ শেখে? আত্মশুদ্ধিতেও মানুষের শিক্ষা হয়। মহারাজকে গুরুমন্ত্রে দীক্ষাদান করালে কেমন হয়? তিনি আমাদের কথা না শোনেন, গুরুর উপদেশ মানবেন।

পালঙ্ক থেকে পা ঝুলিয়ে বসলেন মহারানী, গুরু মা তো ধরছেই। ওই মোছলমান বেশ্যাটা ওকে মন্তর দিয়া বারোভাতারের এক ভাতার করছে, আর গুরুর দরকারটা কী?

সতীনকে ভর্ৎসনা করলেন ছোটরানী, ছিঃ! তুমি হলে রাজেশ্বরী। এ ভাষা তোমার মুখে সাজে না।

এবারে ফেটে পড়লেন মহারানী, হ্যা আমি রাজেশ্বরী। তোর ওই গ্যানের হাওর তুই নিজের গভ্ভে রাখ। মহারাজকে আমার মহল থিকা তাড়াইলাম, দরকারে রাজবাড়ি থিকা তাড়াব।

ছোটরানীও কঠিন হলেন, না। ওসব করবে না তুমি। বরং আদেশ করো। আমি উপযুক্ত রাজগুরুর সন্ধান দিচ্ছি। তোমার আদেশে রাজপ্রতিনিধি সেই গুরুকে প্রাসাদে নিয়ে আসবে।

মহারানীর যে দর্প দিনদিন আকাশ ছুঁয়ে ফেলেছিল, এই মুহূর্তে যেন তা আছড়ে পড়ল মাটিতে। তিনি বুঝলেন, বয়সের কারণে তিনি মহারানী হলেও ব্যক্তিত্বে বা যোগ্যতায় ছোটরানীকে ডিঙিয়ে যাবার ক্ষমতা তাঁর নেই। নিমদাঁতন চিবোনো মুখে তিনি বললেন, মহারাজ তো আমার একলার সম্পত্তি না, আমার যা মনে হইচে করছি। তোর যা মনে হয় করগা। আমাকে এইসবের মদ্যে টানিস না। আমি আর তার মুখ দেখব না।

এক মুহূর্ত কী ভাবলেন ছোটরানী। তারপর বললেন, যেসব পরে দেখা যাবে। আগে তো কাজটা করি। নাও এবার ওঠো দেখি, হাতেমুখে জল দিয়ে খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করো। আমি কিঙ্করীদের ডেকে দিচ্ছি।

ছোটরানী চলে যাচ্ছিলেন। মহারানী ডাকলেন, শোন—

ঘুরে দাঁড়ালেন ছোটরানী।

মহারাজকে তোর বেশি আমি চিনি। সে শুধরাবে না, দেখিস।

কুটিল হাসি হেসে ছোটরানী বললেন, দেখার তো কিছু নেই ডাঙরানী। তুমি তোমার ভাগ ছেড়ে দিয়েছ, এখন শোধরান বা না শোধরান, মহারাজ সম্পূর্ণই আমার।

ছোটরানী চলে যেতেই আহত বাঘিনীর মতন ছটফট করে উঠলেন মহারানী। হুকুমটা এত জলদি না দিলেই ভাল হত। চাঁপাটা এক্ষুণি সব কথা ছোটরানীকে না জানালেই পারত। এখন আর হুকুম ফিরিয়ে নেবার উপায় নেই। সত্যিই যদি ছোটরানী মহারাজকে গুরু ধরিয়ে দেয়? গুরু সাধকদের অনেকরকম তন্ত্রমন্ত্র জানা থাকে। সত্যিই যদি মহারাজ শুধরে যান? যদি ছোটরানী আস্ত একটা ঘরমুখো স্বামী পেয়ে যায়?

দুই হাতে খাটের বাজু জড়িয়ে মাথা ঠুকে ঠুকে গোঙাতে লাগলেন মহারানী, নে গা। আস্তা মানুষটাকে নে গা। মেলেচ্ছ মাগির আইঠা খাওয়ার এত শখ, খা গা। তোকেও আমি আর আমার ঘরে ঢুকতে দিব না দেখিস—

৫।

আনন্দাবাসে আজকাল লালির ডাক পড়ে না। মহারাজ নাকি মহারানীর সঙ্গে বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েছেন, ছোটরানীর উদ্যোগে তাঁর মন্ত্রদীক্ষার আয়োজন চলছে। ভুলকিতে উড়ে উড়ে খবর আসে, জিরা আর গেন্দির অবসর আড্ডা জমে ওঠে। লালি আর তার শার্গিদ তিনজন রেয়াজ করে খেয়ে ঘুমিয়ে কাটায়। দুই দ্বাররক্ষী বিনা কারণে অস্ত্র বাগিয়ে সদর দরজায় বসে ঝিমোয়। ভুলকাভুলকির আদিম গহ্বরে অলস সময় আপনমনে দিনরাত বয়ে চলে।

ওদিকে পতিব্রতা রানীর চেষ্টা, গুরুসাধকের সাধনায় ছাই দিয়ে মহারানীর অনুমান নির্ভুল প্রমাণ করে মহারাজের মন্ত্রদীক্ষা বিফলে যায়। রাজঅন্দরে তাঁর মন তো বসেই না উল্টে মহারানীর মহলে তাঁর ঢোকা নিষেধ জানতে পেরে তিনি ঘোষণা করেন চিরদিনের জন্য প্রাসাদ ছাড়বেন।

একদিন ভুলকাভুলকিতে খবর আসে, মহারাজ ধলুয়াবাড়ি নামে একটি গ্রামে নতুন প্রাসাদ তৈরি করেছেন এবং লালিকেও সেখানে নিয়ে যাবেন। তিনদিনের মধ্যে সমস্ত গোছগাছ সেরে ভুলকির পাট চুকিয়ে ফেলতে হবে।

লালি আজকাল দুই দাসীর সঙ্গগুণে অনেকটা বুঝমান হয়েছে। তার মুখে এখন পাপপুণ্যের কথাও শোনা যায়। নতুন প্রাসাদে যেতে হবে শুনে তার মুখখানা গোমড়া হয়ে গেল।

জিরা বলে, অমন কালাভুসা বদন হইল ক্যান?

আমি বোধহয় রাজাহুজুরের ঘর ভাঙলাম, না?

ও মা, চেংড়ির কথা শোনো। বাপের জন্মে শুনচিস নাচাগানা আলির সঙ্গে রাজায় ঘর করে? আমাদের রাজা বইলে তুই এত মান পাইলি।

জিরা একটু চিন্তা করে বলল, আচ্ছা বাই ক'তো, রাজাহুজুর লালিকে ঘরে তুলবে এইটা দুই রানীয়ে মানবে? বড়টা তো শুনচি ব্যাটাছেলের বাপ। এইটা কোনও চালাকি না তো? পাসাদে নেওয়ার নাম কইরে গারদে না ঢুকায় দেয় আবার।

লালির মাথায় চিনচিন ব্যথা। গেন্দি তাড়াতাড়ি একমুঠো দুব্বোঘাস তুলে এনে রস করে লালির কপালে লাগিয়ে ফেট্টি বেঁধে দিল। তারপর বিছানায় শুইয়ে পাখার বাতাস করতে লাগল।

জিরা আবার বলল, অবশ্য রাজাহুজুরের প্যায়াদাই খবরটা আনছিল। সেইটা মিথ্যা হওয়ার কথা না।

লালি ঘুমিয়ে পড়েছে। হাতের পাখা না থামিয়ে গেন্দি বলল, দেখিই না কী হয়। বিপদ আসলে আমরা দুইজন তো আছিই। নিয়ামত আনোয়ার সেলিমকে দিয়া লালিকে অন্যখানে ভাগায় দিব। মরতে লাগে আমরা মরব। এমনিতেও আর বাচবই বা কয়দিন।

দু'জনের কথার মধ্যেই ছুটে এল গগন, আঈদেবতীর পালকি আসবার লাগচে গো মাসি।

কীঃ!

আঈরানীর পালকি, বলেই গগন আবার ছুটে গেল সদর দোরে।

জিরা আর গেন্দি এক দৌড়ে লুকিয়ে পড়ল দরজার আড়ালে।

সদর দিয়ে পালকি ঢুকছে। বেহারাদের হুহুঙ্কার শোনা যাচ্ছে। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখতে লাগল দু'জন।

চোখ জুড়ানো নকশাদার তাঞ্জাম থেমেছে উঠোনে। আগে পিছে ছয় বেহারা আর চার দাসী। বাইরে দাঁড়ানো দুই ঘোড়সওয়ার। সবারই কী পরিপাটি পোশাক। দুই সখীর মনে একটু পুলক জেগেই মিলিয়ে গেল।

এক বেহারা হাঁকল, কে আছিস রে!

হাঁকডাক শুনে সেলিম আর নিয়ামত বেরিয়ে এসেছিল। তাদের দিকে আবার প্রশ্ন ছুঁড়ল বেহারা, আর কেউ নাই?

এবার জিরা আর গেন্দি গুটি গুটি পায়ে বেরিয়ে এল। আর উপায় নেই। সেদিন পেয়াদাকে মিথ্যে খবর দিয়েছিল, আজ মহারানী তার শোধ তুলবে।

পালকির দরজার পর্দা ফেলা। কেউ নামছে না।

এক দাসী পর্দার সামনে গিয়ে নিচু গলায় কিছু বলতেই পর্দা সরে গেল। যিনি নেমে এলেন তাঁর সাজের জেল্লা দুপুরের রোদকেও লজ্জা দেয়। মুজরো করতে যাবার সময় লালিও ভরপুর সাজে কিন্তু সে সাজ আর এ সাজের আকাশপাতাল তফাত।

মোটাসোটা গোলগাল ফর্সা টুকটুকে মানুষটি সোনালি রঙের মেখলার আঁচল সামলে নিয়ে বললেন, লালবাই কোথায়?

রাগও নয়, হুকুমও নয়, প্রশ্নটা এতই মসৃণ যে জিরা আর গেন্দি ভয়টয় ভুলে গিয়ে লালির ঘরের দিকে তাকাল। দরজায় কখন যেন লালি এসে দাঁড়িয়েছে। এলোমেলো চুল, কাজলমোছা চোখ, গায়ে ওড়না নেই, আতঙ্কে মুখের রং ফ্যাকাশে।

এবার রানী লালিকে জিজ্ঞেস করলেন, কই, লালবাই কই?

যেন ব্যাধের সামনে হরিণী। কাঁপা হাতের আঁজলা তুলে কপালে ঠেকিয়ে তসলিম করল লালি, জী আমি লালবাই।

জিরা ভুল দেখল কিনা কে জানে, রানীর মুখখানা যেন হতভম্ব হয়ে গেল। মনে হল তাঁর হিসেব গুলিয়ে গেল। তিনি যেন বেজায় ঠকে গেছেন।

গেন্দি হাতজোড় করে কেঁদে উঠল, ও খুব ভাল মেয়ে রানীমা, ও কারোর ক্ষতি করে নাই হুজুর, ও খুব—

হাত তুলে গেন্দিকে থামিয়ে দিলেন রানী। তাঁর চোখেমুখে একটা সূক্ষ্ম হাসির রেখা ফুটে উঠল। তিনি সোজা গিয়ে পালকিতে উঠলেন। বেহারারা পালকি তুলে নিয়ে যেমন এসেছিল তেমনই বেরিয়ে গেল।

ভুলকির সবক'টা প্রাণ স্থানু! রানী কেনই বা এলেন, কেনই বা অমন করে চলে গেলেন কারোর মাথায় ঢুকল না।

লালি দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরল গেন্দিকে।

৬।

মহারাজ প্রাসাদ ছেড়ে যাবেন এ খবর পুরনো হয়ে গিয়েছে। নতুন করে হৈ চৈ লাগল যখন প্রচার হল ছোটরানীও মহারাজের সঙ্গে নতুন প্রাসাদে চলে যাবেন।

চাঁপা দেখছিল দিনদিন মহারানী যেন কঠিন থেকে আরও কঠিন হয়ে যাচ্ছেন। কারোর সঙ্গে কথা বলেন না, ঘর থেকে বেরোন না, চাঁপার সঙ্গেও দরকার ছাড়া একেবারে মুখ নাড়েন না এমনকি যেদিন চাঁপা ছুটতে ছুটতে এসে জানাল ছোটরানী মহারাজের সঙ্গে চলে যাচ্ছেন সেদিনও তিনি শুধু শুনলেন, কোনও মন্তব্য করলেন না।

দেখতে দেখতে সেই দিন এল।

এক দাসী সংবাদ আনল ছোটরানী যাবার আগে একটিবার মহারানীর সাক্ষাৎ চান।

দাসীকে হ্যাঁ না কিছুই বললেন না মহারানী। নিজের ঘরে ঢুকে দোর এঁটে রইলেন। ছোটরানী এসে অনেক ডাকাডাকি করলেন, কোনও লাভ হল না। মহারানী উত্তর অবধি করলেন না।

মহারানীর মহল থেকে বেরিয়ে যাবার সময় চাঁপার মুখোমুখো পড়লেন ছোটরানী। তাঁর দৃষ্টিতে একরাশ ঘৃণা ঝরে পড়ল।

চাঁপা অবাক! ছোটরানী হঠাৎ চাঁপার ওপর রাগ দেখালেন কেন? তিনি লালবাইয়ের মহলে গিয়ে যুক্তি পাকিয়ে ধলুয়াবাড়ি চলে যাচ্ছেন মহারানীকে জব্দ করবেন বলে, সব খবর চাঁপা জানে। সতীনে সতীনে কাজিয়া করলে আর দাসীবাঁদীদের প্রাণ যাবে, চাঁপা এটা মেনে নেবে না। এত বছর ধরে সে মহারানীর নুন খেয়েছে, বদলি কিছু তো দিতেই হবে। মহারানীকে যন্ত্রণা দিয়ে ছোটরানী ভেবেছেন স্বামী নিয়ে নতুন করে সংসার করবেন? চাঁপা থাকতে তা হবে না। ছোটরানীকে একদিনের জন্যও শান্তি দেবে না চাঁপা।

৭।

বেশ কয়েকবছর পরের কথা।

এক বিষণ্ণ দুপুরে মহারানী রাজ অমাত্যদের সঙ্গে নিয়ে হাজির হলেন ধলুয়াবাড়ি প্রাসাদে। কয়েক প্রহর আগে মহারাজ উপেন্দ্র দেহ রেখেছেন, তাঁর শিশুপুত্র কুমার দেবেন্দ্রকে রাজধানীতে এনে সিংহাসনে বসাতে হবে এবং মহারাজের জাগতিক দেহ বহন করে প্রাসাদে নিয়ে যেতে হবে।

এসব কাজের জন্য মহারানীর প্রাসাদ ছেড়ে আসার প্রয়োজন ছিল না। তিনি একটি বিশেষ দরকারে এসেছেন।

মহারানীকে পালকি থেকে নামতে দেখেই লালি নিজের মহলে লুকিয়ে পড়েছিল। এখন সে পরিপূর্ণ নারী, আগের মতন কথায় কথায় কাঁদে না, ভয় পায় না। নেহাত আজ শোকের দিনে মহারানীর কাছে অপমানিত হতে হবে তাই তার গা ঢাকা দেওয়া।

মহারাজের শয়নকক্ষে পৌঁছলেন মহারানী। মস্ত পালঙ্কে শেষ ঘুমে নিথর মহারাজ উপেন্দ্র। এখনও ফুলের মালা এসে পৌঁছায়নি, ধূপ জ্বালা হয়নি, আয়ুর্বেদ ভেষজ ওষুধের ঝাঁঝাল গন্ধ ছড়িয়ে রয়েছে গোটা ঘরে।

এক ঝাঁক পরিজন পরিবৃতা হয়ে পালঙ্কের পায়ায় ঠেস দিয়ে মেঝেতে বসে কাঁদছিলেন ছোটরানী। সেই ঢলঢল লাবণি চেহারা থেকে উধাও, যেন শুকনো ফুল খসে পড়েছে বোঁটা থেকে।

মহারানী শক্ত গলায় বললেন, বিরাণ!

ঘর ফাঁকা হয়ে গেলে ছোটরানীর মুখোমুখি বসলেন মহারানী। বিকৃত গলায় বললেন, ছেলে বিয়ায় সামী সোয়াগের নমুনা দেখাইচিস, আর দুঃখ কিসের তোর?

কোন সময়ে কী কথা! কান্না থামিয়ে বিরাগভরা চোখে তাকালেন ছোটরানী।

কিন্তু তোর সোয়াগের এইখানেই ইতি। এখন থিকে মহারাজ আমার দখলে।

মহারানীর কি মাথা বিগড়ে গেল? ধন্দে পড়লেন ছোটরানী।

অনেক হইচে, আর না। অনেক জব্দ করছিস আমাকে। অনেক জেতা জিতচিস, আর অপমান না।

মৃদু স্বরে ছোটরানী বললেন, আমি অপমান করেছি তোমাকে?

তুই আর তোর ওই নয়া সতীন। কই সে, ডাক।

পালঙ্কে মহারাজের মরদেহ, মনে উত্তাল শোক, সবকিছু ভুলে নিনাদিতা হলেন ছোটরানী, থামো! তোমার বাচালপনা বন্ধ করো।

ঘরে যেন তোপের গোলা পড়ল।

অপমান আমি করিনি, তুমি করেছ। তুমি করিয়েছে। চাঁপাকে দিয়ে একবার মহারাজকে একবার আমাকে। কী বলে পাঠিয়েছিলে, আমি লালবাইয়ের সঙ্গে যুক্তি করে মহারাজকে তোমার থেকে সরিয়ে এনেছি বলে তোমাকে সবার কাছে ছিছিক্কার শুনতে হয়েছে? চাঁপার কাছে এ কথা শোনার পর থেকে আজ এতগুলো বছর আমি অপরাধীর জীবন কাটাচ্ছি। এই কথাগুলি এখন বলা উচিত নয় জানি, কিন্তু প্রাসাদে গিয়ে আর সময় পাব না তাই বলতে বাধ্য হচ্ছি।

কান্তাপুরের রাজরীতি, স্বামী মারা গেলে স্ত্রী কে সহমরণে যেতে হয়। কিন্তু মহারানী এ রীতির বাইরে অতএব ছোটরানীর আর সত্যিই বেশি সময় নেই।

বজ্রাহতের মতন বসে রয়েছেন মহারানী। ছোটরানী বলে চললেন, লালবাঈকে নতুন প্রাসাদে ঢুকতে দেবো না ভেবেই আমি দেখা করতে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম সেদিনই ওকে নিজের দেশে পাঠিয়ে দেব। কিন্তু ওকে দেখে বুঝলাম ওইটুকু মেয়ে আর যাই পারুক, আমার সংসার ভাঙতে পারবে না। তখনই আমি ঠিক করি মহারাজের সঙ্গেই থাকব। তোমাকে সব কথা জানাতে চেয়েছিলাম, তুমি দেখা করলে না। এখানে এসে দেখলাম লালবাই নাচগান করে, সে দেহনটী নয়।

মহারাজের শয়নকক্ষে পৌঁছলেন মহারানী। মস্ত পালঙ্কে শেষ ঘুমে নিথর মহারাজ উপেন্দ্র। এখনও ফুলের মালা এসে পৌঁছায়নি, ধূপ জ্বালা হয়নি, আয়ুর্বেদ ভেষজ ওষুধের ঝাঁঝাল গন্ধ ছড়িয়ে রয়েছে গোটা ঘরে।

মহারাজ আমাদের কারোর বিশ্বাস নষ্ট করেননি। তিনি বিধর্মী হননি। আমাকে ছেলের মা হবার সৌভাগ্য দান করেছেন।

মহারানী অস্ফুটে বললেন, এইসব আমাকে জানানো যাইত না?

চোখমুখ সাপটে ছোটরানী বললেন, সনকা নিজে গিয়েছিল তোমার কাছে। চাঁপা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। বলেছে তুমি আর আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাও না।

মহারানী নীরব রইলেন। এতদিন ধরে যা মগজে গেঁথে গিয়েছে তা কি একপলকে মিথ্যে বলে মুছে ফেলা যায়? দোলাচলে পড়তে হয়।

মহারাজের দেহ সাজানোর লোক এসেছে। ছোটরানী এক হাতে মহারানীর হাত চেপে বললেন, আমার একটা অনুরোধ রেখো। লালির আর এখানে থাকার মানে হয় না। ওকে দলের সঙ্গীদের সাথে ফারহাবাগে ফেরত পাঠিয়ে দিও।

মহারানীর বুকে তোলপাড়। সব কথা ছাপিয়ে কেবল একটি নাম ভেসে উঠছে বারবার, চাঁপা।

ছোটরানী কাঁদতে কাঁদতে উঠে দাঁড়ালেন, দেবতার আশীর্বাদে ছেলে হয়েছিল বলে মহারাজ কুমারের নাম রেখেছিলেন দেবেন্দ্র। আমার যত অপরাধ আমি মাথা পেতে নিলাম। দেবেন্দ্রকে তুমি বুকে করে রেখো। ওকে কষ্ট দিয়ো না। ও যে শিশু...

৮।

অভিষেকের আয়োজন হতে দিন গড়িয়ে গেল। মহারাজের দেহ ফুলে ফুলে সাজিয়ে রাখা হয়েছে, নতুন রাজা সিংহাসনে বসবেন তারপর অগ্নিসংস্কার হবে। ছোটরানীর শেষ ইচ্ছে ছেলেকে রাজা হতে দেখবেন কাজেই তাঁকেও সহমৃতার পোশাক পরাতে একটু দেরি আছে। রাজপ্রাসাদে আত্মীয় পরিজন কর্মচারী দাসদাসী এবং নগরের সমস্ত প্রজাদের বিপুল ভিড়। এমন সময় সবার অলক্ষে প্রাসাদের উত্তরদিকের মন্ত্রণা কক্ষে আলো দেখা গেল।

পদস্থ রাজপুরুষদের বিশেষ তলব দিয়েছেন মহারানী। তাঁরা কেউ জানেন না এই জরুরি বৈঠকের কারণ কী। তবে তাঁদের অপেক্ষা করতে হল না। উন্মত্ত পদক্ষেপে ঘরে এসে দাঁড়ালেন মহারানী। কোনও ভনিতা ছাড়াই বললেন, ছত্রধারী শ্রী শ্রীমন্ত মহারাজের দেহান্ত হয়েছে। এবারে রাজকুমার দেবেন্দ্র সিংহাসনের উত্তরাধিকার পাবেন। কিন্তু যেহেতু তিনি নাবালক অতএব তাঁর হয়ে রাজকার্য চালাবেন কুমারের রাজমাতা ছোট আঈদেবতী। আপনারা এতদিন যেভাবে রাজদণ্ড আগলে এসেছেন, এবারেও তাই করবেন।

মহামন্ত্রী আশ্চর্য হলেন। এতদিনের চেনা মহারানীর সঙ্গে এই মহারানীর মিল নেই। হঠাৎই যেন কোনও মন্ত্রবলে এক সাধারণ রাজবধূর মধ্যে রাজন্যার লক্ষণ ফুটে উঠেছে।

খাসনবীশ জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু মহারাজের সঙ্গে সহমরণে যাবেন কে?

আমি। আমি সেই দায়িত্ব পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

মাফ চাইছি দেবতী, কিন্তু এটি নিয়ম বিরুদ্ধ।

হোক। আমি এত বছর নিঃসঙ্গ থেকেছি, এবারে আমি আমার স্বামীসঙ্গ চাই। আপনারা এতে আপত্তি করবেন না।

আমাত্যেরা মাথা নিচু করে রইলেন।

হাতজোড় করে সবাইকে বিদায় জানিয়ে মহারানী হাঁকলেন, রক্ষী!

ইঙ্গিত বুঝে সকলে মন্ত্রণাকক্ষ ছাড়লেন।

রক্ষী এসে কুর্নিশ করলে মহারানী বললেন, পাটোয়ারী আর খাঁড়াধরাকে ডেকে আন। এক্ষুণি।

প্রথমে এলেন পাটোয়ারী।

মহারানী বললেন, তহবিল থেকে একশো মুদ্রা তুলে পালকি আর লেঠেল নিয়ে ধলুয়াবাড়ি প্রাসাদে যাও। লালবাইয়ের হাতে মুদ্রা দিয়ে তাকে দলবলসহ কান্তাপুরের সীমা পার করে দিয়ে এসো। বোলো, সে যেন দেশে ফিরে যায়।

খাঁড়াধরা যখন এল তখন দেবেন্দ্রর অভিষেক শেষ। ডঙ্কা বাজছে, প্রজাদের জয়ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। এখন মোহর ছাপা হলেই মহারাজের শশ্মানযাত্রা। আর দেরি নেই। স্বামী সোহাগের দখল পাবার শুভক্ষণ এসেই গেল।

একখানা কাঁকন হাত থেকে খুলে খাঁড়াধরার দিকে এগিয়ে দিলেন মহারানী, আমার খাস দাসী চাঁপা।

এ কাহিনি সত্যাশ্রিত। ঘটনাকাল ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দ। কোচবিহার রাজপরিবারের শৌর্য বীর্যের ইতিহাস যথেষ্ট লেখা হলেও স্তিমিত রাজ অন্দরের ভাঙাগড়ার রোমাঞ্চকর কাহিনিগুলি ইতিহাসের নিয়মেই থেকে গিয়েছে অধরা ও অপ্রকাশিত। অথচ সেগুলিও রহস্যে রোমাঞ্চে প্রেরণায় ভাললাগায় নেহাত ফেলে দেবার মতন নয়। একটু নজর করলেই দেখা যায় সেখানেও অনেক সঞ্চয়। 'রাজন্যা' সেই সঞ্চয়েরই ছোট্ট একটি অংশ। অন্দরের তথ্য প্রায় নেই, কাজেই গল্প গাঁথতে গিয়ে বেশ খানিকটা কল্পনার আশ্রয় নিলেও, চরিত্রের দাবিতে কিছু অপ্রিয় সত্য তুলে ধরলেও আমি সুচন্দ্রা ভট্টাচার্য মনে প্রাণে কোচবিহার রাজতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবান এবং রাজভক্তিতে নিঃশর্ত নতজানু।

মহারাণী কথা

মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস

সম্রাজ্ঞীর কলেজ পর্ব শেষ হল। মনের ভিতর উচ্ছল আনন্দ বাবা মার, সঙ্গে নিজেরও। ছোটবেলার স্কুলের উপর অভিমান কি ফিরে দাঁড় করিয়ে দেয় রানীকে! শিক্ষাসত্রটির আনুপূর্বিক ফিরে দেখায় কত কীই যে ভাল, সে ছবিগুলোই স্মৃতি, সে ছবিই বেঁচে থাকা। শহর ছেড়ে দূরের পাঠে মানুষ আরও দৃঢ় হয় বুঝি। মহারানী সুনীতিদেবীর জীবনের টানা পোড়েনে কষ্টি পাথরে নতুন মানুষ উঠে আসে। মার সঙ্গে রানির এক আলাদা জীবন মুহূর্ত, নবদ্বীপে মার ছেলেবেলার ঘর চেনা, চিনে ওঠা। সুনীতি দেবীর আনন্দমেলা, কথকতা, লোককথায় নিজেকে মিলিয়ে নেয় সম্রাজ্ঞী। বৈষ্ণববাড়ির মেয়ের কীর্তন আসরে টান টান আকর্ষণ সব নিয়ে সম্রাজ্ঞীও এক অন্য মানুষ। সম্রাজ্ঞীর ছোটবেলার গুণগুলো আর অদম্য উৎসাহ কী ভীষণ মিলে যায় মহারানীর সঙ্গে। স্মৃতিচারণে উঠে আসে একে একে চেনা মুখ, সুনীতিদেবীর কাজ, রেখে যাওয়া স্বাক্ষর, অমিয় জ্যেঠুর আগমন সম্রাজ্ঞীকে আনন্দ মুখর করে। মহারাণীর সৃষ্টিকথার সম্ভার মেলাতে মেলাতেই যুগান্তরে সম্রাজ্ঞীর প্রথম গল্প প্রকাশের খবর! আহা! পাখি হয়ে যায় সে।

কলকাতা আলিপুরের উডল্যান্ডসে বড় ব্যালকনি বারান্দায় একা দাঁড়িয়েছিলেন মহারানী সুনীতি। আজ গার্ডেন পার্টির সম্পূর্ণ দেখাশোনা করছেন তিনি। অজস্র জটিলতা, দুঃখ, বিষন্নতা সব তো তাঁর জীবনেরই সঙ্গী। সে সব ঝেড়ে ফেলে দেওয়ার শিক্ষাও পিতৃদেবের কাছ থেকে মজ্জাগত হলেও নিজের কাজের মধ্যে দিয়ে বার বার তার অসাধারণ পরিচয় তিনি রেখে চলেছেন। এই যে মানুষের জন্য, বিশেষত নারীদের জন্য নিজস্ব ভাবনার পরিসর যেভাবে বিচিত্র ও বিস্তৃত করেছেন তিনি, তাতে শুধু রাজনগর, শুধু কলকাতা কেন গোটা বিশ্ব আজও অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ওই স্প্যানীয় কায়দায় সাদা কাপড়ের উষ্ণীষ আর শিরস্ত্রাণের দিকে, সুন্দরী মহীষীর মুখাবয়বে। কোনও এক জায়গায় তো স্থির হয়ে বসে থাকতে তাঁর ভালও লাগে নি, কর্মহীন জীবনের কথা ভাবতেও পারেন না। ছড়িয়ে দিতে চান তাঁর সেবা, যেটুকু শিক্ষা সবটুকু। একজন দেশীয় রাজার মহিষী তিনি কিন্তু অসম্ভব নিরহঙ্কারী। ধর্ম তাঁর নিজস্ব। লেগে থাকা ব্রাহ্মধর্মে মিশিয়েছেন নিজের মত করে মানবধর্ম। ১৯১১সালে নৃপেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর পিতৃ প্রতিস্থাপিত নববিধান সমাজ ও বিবিধ জনহিতকর কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন তিনি। আসলে একজন সম্পূর্ণার ভাবনা ছড়িয়ে গেছে দিগ্বিদিকে, পাশাপাশি মনের ভিতর অসংখ্য নিঃসঙ্গ অন্ধকার গ্রাস করছে একে একে সময়ের আবিলতায়। অভিজ্ঞার এই দুঃখ সহন যন্ত্রণার সঙ্গে প্রসঙ্গক্রমে আবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চলে আসেন। গার্ডেন পার্টির এই তদারকি মূর্তিটি রেলিং বারান্দার আঁধার আলোয় অদ্ভুত শুভ্র ছায়ামূর্তি।

সম্রাজ্ঞীর ভিক্টোরিয়া ইন্সিটিউশনের হোষ্টেল বারান্দা থেকে স্পষ্ট দেখে সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের চূড়ায় দাঁড়ানো পরীটি কখন যেন মহারাণী হয়ে নেমে আসেন। হাতে জীবন্ত সে ছুঁয়ে দেওয়া যাদুকাঠি। সে যষ্টির যাদুকরীতে তিনি বদলে দিতে পারেন সকলকে। নারী জীবনের দুঃখ আঘাত, মর্ম যন্ত্রণা।

জীবনে বারবার দুঃখ নেমে আসা আর দুঃখের যন্ত্রণাকে মৃদু হেসে বরণ করেও হাসিমুখে স্থির, দৃঢ়, উদার দুহাতে আগলে নিতে বোধহয় মহৎ আত্মাই পারেন, যেমন পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বার বার মৃত্যুও এসে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে তাঁর প্রিয়জনদের একান্ত নিকট আত্মার আত্মীয়দের, ভেঙে পড়েন নি। বৃহৎ কাজের মধ্যে ডুবতে ডুবতে অন্ধকারই আলো হয়ে উঠেছে তার কাছে। মুখের রেখায়, কপালের খাঁজে কতবার দাগ পড়েছে তবু মানুষের কবি মানুষ ধর্মেই তো নিয়োজিত ছিলেন আমৃত্যু।

ভিক্টোরিয়ার মাথায় দাঁড়ানো পরী যেমন দিক বদল করে তবু দাড়িয়ে পড়ে মুহূর্মুহূ। সুনীতিদেবী তেমনি ডায়নামিক। কোচবিহারের মেয়েরা তখনিই আধুনিক শিক্ষা পেতে শুরু করেছে মহারাণীর হাত ধরে। তাঁর প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার ফলস্বরূপেই কোচবিহারে একাধিক বালিকা বিদ্যালয়। মেয়েরা সেসময় বিনা বেতনে যাতে শিক্ষার সুযোগ পায় সে ব্যবস্থা তো রাণীই করেছেন। ছাত্রীদের কাছে নিত্যেন্দ্রনারায়ণের স্ত্রী নিরুপমা দেবীকে নিয়ে মাঝে মাঝে স্কুলের বিরাট হলঘরের সাজানো পরিচ্ছন্ন ঘরে মাঝে মাঝেই এসে দাঁড়ান রাণী। সম্রাজ্ঞীর মন জুড়ে বুক জুড়ে সে ছবি। যেখানে সম্পাদক (পরিচারিকা পত্রিকার), সু লেখিকা, গায়িকাকে সঙ্গে এনে মহীয়সীদের জীবন এবং বাণী গল্পের মত বলতেন, নিবিষ্ট হয়ে ছাত্রীরা শুনত, সেই সময়ে চলে যায় সম্রাজ্ঞী মহারাণীর আত্মকথার পৃষ্ঠায়, নিজের জীবনকথাও বলতেন ছাত্রীদের। বাবার ঘরে কাজের মানুষ না এলে সব কিছু

নিজে হাতে করার অভ্যেস ছিল বলেই রাজবাড়ির শতেক পরিচারক পরিচারিকা থাকলেও রান্নাঘরের কাজ কিংবা আনাজ ফল কেটে সাজিয়ে রাখা, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে সময় কাটানো— সব করতেন তিনি। ভালবেসে করেছেন, মহারাজের সঙ্গে কতটা নৈকট্যে থাকলে রাজবাড়ির পর্দা প্রথা শুধু নয়, অন্যান্য প্রথার মধ্যে কাটিয়ে ধীরে ধীরে নিজস্ব গুণে সব সংস্কার দূর করতে পেরেছিলেন।

সম্রাজ্ঞীর স্কুল পর্ব শেষ হল যেদিন, মাধ্যমিক শেষ হওয়ার একমাসের মধ্যে ফিরে পাওয়া মানে ঝাঁপিয়ে পড়া রাজনগরের পথে প্রান্তরে। আর তারপর থেকে এই কলেজেই তো প্রাণের সঙ্গী, আত্মার আরাম। হুড়মুড়িয়ে দ্বাদশও কেটে গেছে, অনার্সের পালায় সে তো অন্যমানুষ। বাবা রাজীব যেন দেখিয়ে দিয়েছেন, আকাশে তাকাতে হয় মা, তবেই শীর্ষ ছোঁয়া যায়। পাহাড় চূড়া। মহারাণীর আত্মা রাতের আলোয় জ্যোৎস্নার মধ্যিখানে এসে দাঁড়ান মাঝে মাঝে। সম্রাজ্ঞীর পূর্ণ যৌবনের মনের আড়াল আবডালে এসে দাঁড়ান, আঙুল তুলে কী নির্দেশ দেন ভাল বুঝতে পারে না সম্রাজ্ঞী। যে রাজবাড়ির অন্দরমহলে তখনও ঢোকাই হয় নি, ভাল করে দেখা হয় নি ঘর, মাঠ, বিরাট হলঘর, বিলিয়ার্ড রুম, রাজকীয় ঝাড়বাতি সবটা, তবু পড়তে পড়তে আর গল্প আখরে ঢুকে পড়ে মনের ক্যানভাসে। সেখানে মহারাণীর আত্মকথারা সমকালীন সমাজচিত্র, ইতিহাস জানিয়ে দেয়। রুশোর দুঃসাহসিক আত্মকথা 'কনফেশনস' যেমন সমকালীন ফরাসী সমাজকে জানাতে সাহায্য করেছিল, টলস্টয় বা কবি পুশকিনের আত্মকথা পড়ে জার আমলকে আর সমকালীন রাশিয়ার সমাজ জীবনকে যেমন জানিয়ে দেয় তেমনি উচ্চারণ আমাদের মহারাণীর সম্রাজ্ঞী প্রাণে মনে তার অস্তিত্ব টের পায়। কানের ভিতর বেজে যায় উডল্যান্ডসে মহারাণীর গার্ডেনপার্টির নিভৃত বাজনা। যেখানে বাংলার প্রথম গভর্নর লর্ড কারমাইকেলের স্ত্রী লেডি কারমাইকেল উপস্থিত ছিলেন। অত্যন্ত প্রীতির সম্পর্কে বাঁধা ছিলেন কারমাইকেল দম্পতি সুনীতিদেবীর সঙ্গে। গোটা পৃথিবী তাকিয়ে ছিল এই এক প্রান্তদেশীয় মহারাণীর ক্রিয়াকর্মে এবং সাহিত্যের ধারায়। সকলের দৃষ্টি আটকে গিয়েছিল ততদিনে। কেশবচন্দ্র সেনের দৃঢ়তা নিয়ে যে নারীর সুচিন্তন, সুকর্ম প্রেরণা ছড়িয়েছিলেন কোচবিহারের এ প্রান্ত থেকে কৌণিক বিন্দু পর্যন্ত, এ শতকের গোড়ার দিকে ইংরেজিতে প্রথম ভারতীয় আত্মজীবনী রচয়িত্রী তো তিনিই। প্রথম একজন ভারতীয় মহারাণী যাঁর আত্মজীবনী বিদেশের বিখ্যাত প্রকাশন সংস্থা প্রকাশ করেছে, শুধু বাংলা বা ভারতবর্ষ নয়, বহির্ভারতেও এ গ্রন্থের এক বিশিষ্ট স্থান আছে।

১৫

সম্রাজ্ঞীর বুকের ভেতর উদার নীল আকাশ। রাজনগর তাকে গর্বিত করে। এখানকার মাটি ধূলি মাথা থেকে পা মেখে নিতে ইচ্ছে হয় বার বার, দূরান্তের ডাকে যেতে তো হবেই। বাইরে পড়তে যাওয়ার ডাক, শিক্ষার আহ্বান। এখন আর ভয় করে না ওর। ওর সঙ্গে ওর ভাবনায় আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার বাতাস। কোচবিহারের রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা অবদান শাসনকাজের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রেও আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকে যে! রাজ অন্তঃপুরের সাহিত্যচর্চায় চিরাচরিত প্রথা বা ইতিহাস অনুযায়ী অন্তঃপুরের পর্দার আড়াল থাকলেও সাহিত্যচর্চায় নিজেদের উজাড় করেছেন বৃন্দেশ্বরী দেবী তাঁর 'বেহারোদন্ত' গ্রন্থে। আর মহারাণীর কথা ভাবলেই তাঁর পরিধি বিস্তৃতি সম্রাজ্ঞীকে আরও কয়েকধাপ এগিয়ে দেয় সাহসী করে তোলে। কেশবচন্দ্র সেনের কথা পড়তে গিয়ে তাঁর মা সারদা সুন্দরী দেবীর 'আত্মকথা'ও হাতে পেয়ে যায় সে। আহা! সে পথে গিয়ে কেশবচন্দ্রও রচনা করেছেন 'আত্মজীবনী', 'জীবনবেদ'ও তাঁর আর এক বই।

সম্রাজ্ঞীর একা মনে হয়, বড় একা। শূন্যত পাখায় ভর করে সে উদাস প্রান্তরে হেঁটে যাওয়া এক মেয়ে। চলে যেতে হবে রাজনগর ছেড়ে, তোর্সার প্রবল জলোচ্ছ্বাস ছেড়ে, যৌথ বাড়ির বারো মাসে তের পার্বণ ছেড়ে কোনও নদীর ধারে গিয়ে দাঁড়াবে। হৈ হৈ দিন। নাটকের রিহার্সাল, কমনরুম পেরিয়ে আসা ইলেকশনের রুম, প্রবেশ পথেই ব্রজেন্দ্রশীলের আবক্ষ মূর্তি, সঙ্গে লাগানো আধো অন্ধকার গ্যালারি টাইপ ক্লাস ঘর। কুসুমিত আড্ডাঘর, রিহার্সাল, আলেখ্য, নাটক সব ফেলে মাষ্টারমশাইদের স্নেহের ছায়া ছেড়ে, সেই লুকিয়ে রাখা অরুণের মুখখানা ফিরে গিয়েও ফিরে আসা স্থাপত্য মূর্তির মত লেগে থাকে ধূসর পাণ্ডুলিপি হয়ে।

গতকাল কলেজ ফেস্ট শেষ হল। রাজার শহরে

রুশোর দুঃসাহসিক আত্মকথা 'কনফেশনস' যেমন সমকালীন ফরাসী সমাজকে জানাতে সাহায্য করেছিল, টলস্টয় বা কবি পুশকিনের আত্মকথা পড়ে জার আমলকে আর সমকালীন রাশিয়ার সমাজ জীবনকে যেমন জানিয়ে দেয় তেমনি উচ্চারণ আমাদের মহারানীর সম্রাজ্ঞী প্রাণে মনে তার অস্তিত্ব টের পায়।

রাজার মতই হেঁটে বেড়ানো স্তব্ধতায় রাত নেমেছিল। মঞ্চে 'দেবতার জন্ম'র মঞ্জরী চরিত্রে অভিনয়। বহু চেষ্টা করেও ওরা অরুণের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে নি। রানি তো মনে মনে চেয়েছিল দেখা হোক, শেষবার চলে যাওয়ার আগে। নাটকের রিহার্সালের ফাঁকে কতবার পূর্ণ দৃষ্টিতে গেঁথে নিতে পারত সে মুখ। তারপর তো কে কোথায়! ...কতদূর...বিজনে। ফোন ছাড়া তো কত সংযোগ বিচ্ছিন্ন, এদিক ওদিক, প্রযুক্তি বিদ্যার কারসাজিতে এখন মুহূর্তে দূরকে কাছে টেনে রাখে। ওসব সম্রাজ্ঞীর চাই না। ও তো চিঠিপত্রের মানুষ। সে তো কখনও ভাবেইনি বাবা মাকে ছেড়ে থাকা যায়! মাঝখানে মহানগরী টেনেছিল বটে। মা ছিল সঙ্গে সবসময়ের বন্ধু, মাঝে মধ্যে বাবা... গড়ের মাঠ, গঙ্গার ধার, কিংবা চিড়িয়াখানার সঙ্গী। আর প্রতি শনিবারে নাট্য একাডেমিতে নয়তো মিনার্ভায়। এই করেই তো কেটে গেল, এখন পাকাপাকি আঙুল ছেড়ে দাঁড়াতে হবে, যেমন আঙুল ছেড়ে, বট গাছের ছায়া ছেড়ে দাঁড়াতে হয়েছিল মহারাণীকে। কেশবচন্দ্র তৈরি করেছিলেন আর পাশে পেয়েছিলেন সহমর্মী মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণকে, যিনি সুনীতির প্রতি শ্রদ্ধা সম্ভ্রমে রাজবাড়ির নানা নিয়ম বদলে দিয়েছিলেন, নিজেও বহুবিবাহের রাস্তা দেখানোকে পাপ বলে মেনে নিয়েছেন। ব্যক্তিত্বময়ী মহারাণী যোগ্য মর্যাদায় নারী শিক্ষা নারী সমিতির সার্বিক উন্নয়নে কাজ করে গেছেন, পাশে পেয়েছেন মহান রাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণকে। কাদম্বিনী লাহিড়ীর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 'ভারত মহিলা সমাজ'-এর তিনিই ছিলেন পৃষ্ঠপোষিকা। স্বর্ণকুমারী দেবীর সখী সমিতি, মহিলা শিল্পাশ্রম প্রভৃতি নারী সংগঠনের সঙ্গেও মহারাণী জড়িয়ে ছিলেন ওতপ্রোত। এমনকী বিলেতেও 'Sister hood of the east' এই মহিলা প্রতিষ্ঠানেও তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সভানেত্রী। নারী পুরুষ বৈষম্য দূর করতে এ সংগঠন কাজ করেছিল নির্ভীকভাবে। সম্রাজ্ঞীর ভাবতে ভাল লাগে যে মহারাণী তাঁর শ্বশুর নরেন্দ্রনারায়ণের 'কোচবিহার হিতৈষিনী' সভার কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁরই চেষ্টায় ১৮৮১ সালে রতিকান্ত বকসীর বিদ্যালয়কে অধিগ্রহণ করা হয়। নতুনভাবে নারীশিক্ষার প্রধান পীঠস্থান রূপে গড়ে তুলেছেন মহারাণী তাঁর নিজের স্বপ্নের সুনীতি একাডেমী। স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের নতুন এক দিগবলয়।

সম্রাজ্ঞীর জীবনে এ বিদ্যালয় থেকে কয়েক বছরের ছেদ এলেও বড় রাস্তা ধরে সাগরদীঘির দিকে এগিয়ে যেতে বড় মায়াময় চোখে তাকিয়ে থাকত লাল ইটে খোদাই শরীরে সুনীতি একাডেমী এই নাম।

প্রথম থেকেই কৃতিত্বের সাক্ষর। প্রথম প্রধান শিক্ষক নগেন্দ্রনাথের লেখায় সে সময়ের সুনীতি একাডেমীর প্রাচুর্যবিহীন শৌর্যের পরিচয় নিংড়ে নিয়েছে সম্রাজ্ঞী। ১৯১৬ সালে সুনীতি কলেজের নতুন নাম হয় সুনীতি একাডেমী। ১৯২৪ সালে মহারানী সুনীতিদেবীর চেষ্টায় রাজ্য শিক্ষা দপ্তর স্কুলটির আর্থিক ব্যয়ভার নিলে এই স্কুল সরকারি মর্যাদা লাভ করে। এতদিন পর্যন্ত মহারানীর আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতাতেই চলছিল সুনীতি কলেজ। তখন অবৈতনিকও ছিল। সুনীতি দেবী সম্রাজ্ঞীর শ্রদ্ধেয় মহারাণী ভাগ্যবতী, দেখে যেতে পারলেন সুনীতি একাডেমীর ১৯২৮ সালের ১লা জানুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ।

একটু কি শূন্যতা আসে ভাবনায়! প্রিয় রাজনগরের নাম, মহারাণীর তীব্র ঐকান্তিকতা ও পরিশ্রমের ফসল তাঁর দ্বিতীয় ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হল পিতৃ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় 'নেটিভ লেডিজ নর্মাল অ্যান্ড এ্যাডাল্ট স্কুল এ্যান্ড গার্লস স্কুলে'র যে প্রতিষ্ঠা তা বিভক্ত হয়ে ১৮৭৮ সালে 'মেট্রোপলিটন ফিমেল স্কুল' ও ১৮৮২তে 'ইন্সিটিউশন ফর দ্য হায়ার এডু কেশন অব নেটিভ লেডিজ' নামে দুটি প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। এই দুই প্রতিষ্ঠান আবার একসঙ্গে যুক্ত হয়ে ভিক্টোরিয়া কলেজ হিসেবে আত্মপ্রকাশ। ১৮৮৩ সালের ১লা জানুয়ারি কেশবচন্দ্র সুনীতি দেবীকে কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্য আর মহারাজাকে পৃষ্ঠপোষক করে দেন। ১৮৮৪তে কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যুর পর মহারাণী সুনীতি দেবীর অর্থানুকূল্যেই কলেজের ব্যয়ভার নির্বাহ হত। কী আশ্চর্য প্রাণশক্তি!

সম্রাজ্ঞী চোখের সামনে দেখতে পায়, কলকাতায় এসেছেন মহারাণী। নিজে পরিদর্শনে যাচ্ছেন, কখনও কখনও নৃপেন্দ্রনারায়ণও সঙ্গে হেঁটে যান। কলকাতায় প্লেগের প্রাদুর্ভাবে ১৮৯৮তে সাময়িক ভাবে যে কলেজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, সুনীতি দেবীর উদ্যোগেই আবার তা চালু হয় ১৯০১ সালের ১২ইআগষ্ট। তবে তখন ভিক্টোরিয়া কলেজের নাম বদলে হল ভিক্টোরিয়া ইন্সিটিউশন।

মহারাজার হলদেটে সাদা ঘষা পাথরের মূর্তি, মাথায় উষ্ণীশ, বড় জীবন্ত মনে হয় প্রতিদিন। তাকিয়ে থাকে রানি। আজ হৈ হৈ করে বিদায়ী কলেজমেটরা বার্ষিক ফেষ্টিভ্যাল শেষ হওয়ার পর নাটক রিহার্সাল আর আলেখ্যের সুরেলা বাতাবরণ সবার মনেই। সাগরদীঘিকে মাঝখানে রেখে সন্ধের জমজমাটি আলো ছেয়ে থাকা চওড়া রাস্তাগুলো আজ যেন নতুন করে

দেখছে ওরা। সাগরদীঘির ধারে বাঁশের বেড়া দেওয়া ঘরের পাশে রাজহাঁসেদের বিবিধ চলন। আর ডাক। ওরা আজ চাঁদকে মাথার উপর নিয়ে বোটিং করবে। ঘুরে ঘুরে পাক খেয়ে উদাত্ত বোটিং... আহা! একসঙ্গে গেয়ে ওঠে ওরা 'আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে....'

সদ্য অবসর নেওয়া রাজীবের উৎসাহের সীমা নেই। সে ওদের নাটকের ব্যাপারেও, আবার বিভিন্ন অনুষ্ঠান সেমিনারেও। আজ সবাইকে নিয়ে বাড়ির বৈঠকখানায় জমিয়ে আড্ডা হবে ভেবে রেখেছিল, সব ছক পালটে দিল ওরা নিজেরাই। সিনেমা দেখতে ইচ্ছে হল। আজ শেষদিন। ... চল চল সাগর দেখব, নতুন বই। আহা! মন ভরে আছে।

নৃপেন্দ্রনারায়ণের মূর্তির পৌরুষত্ব আর বলিষ্ঠতা রানিকে অন্যমনস্ক করে। আবার কোথায় যেন চলে যায়, ভিড়ের ভিতর দাঁড়িয়ে থেকেও নিতান্ত একা হতে পারে মেয়ে। কখন যেন মহারাজার উষ্ণীশের চেহারা অরুণ হয়ে যায়। এসব ফ্যান্টাসির মানে নেই জানে। ভিতরে ভিতরে শাসন তর্জন চলে, কই সম্রাজ্ঞীর মনের ভিতরের সাদা পৃষ্ঠা তো সাদা হয় না! নীরা বলে, আবার দাঁড়িয়ে পড়লি? হ্যাঁ রে, এখানে এলে ওই মূর্তিটাকে বার বার দেখতেই ইচ্ছে করে। বাবার কাছে রানির শোনা গল্পে মহারাজা বলতেই যাঁর ছবি ভেসে ওঠে তিনি নৃপেন্দ্র নারায়ণ। মহারাণীকে যিনি দিয়েছেন সহযোগিতা, সঠিক পথের সন্ধান, যোগ্য মর্যাদা। সুনীতিও রাজবাড়িকে ভালবাসতেন প্রাণের চেয়েও বেশি। আত্মজীবনীতে বলেছেন, 'ভারতের রাজপ্রাসাদগুলির মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরতম রাজপ্রাসাদ। পাশ্চাত্য দেশের একজন বিশিষ্ট স্থপতি রাজপ্রাসাদটির নক্সা তৈরি করেছিলেন। আর এর নির্মাণ কাজও অপূর্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে দাঁড়িয়ে। কারুকাজ ভরা পূর্ণ দরবার কক্ষটি ছিল আমাদের গর্ব। পূর্বদিকে মাঠ ঘিরে ছিল সারি সারি তোরণ ও ছোট ছোট স্তম্ভ। সিমেন্ট ও টেরাকোটা কাজ প্রাসাদের কারুকাজে রয়েছে। প্রাসাদের একদিকে স্নানাগার, অন্যদিকে ঘেরা রেকেট ও টেনিস খেলার মাঠ। ফুলের বাগানগুলি অনুপম। পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হত তোর্সা নদী। পূর্বদিকে ছিল শহর ও উত্তরে তাকালে দূরে বিশাল হিমালয়কে দুর্গের মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যেত। শীতকালে মেঘমুক্ত দিন, পরিষ্কারভাবে তুষার দেখতে পেতাম। বসন্তকালে বাগানে রাশি রাশি ফুল ফুটত।' এই সব ছায়াছবিরা আজ সম্রাজ্ঞীদের ঘিরে রেখেছে। বদলে গেছে অনেক সে রাজবাড়ি। মানুষ নাইবা থাকল, কিন্তু সে সৌন্দর্যের কণা তুলে নেবে কার সাধ্য? আসলে এই যে পুরনো হয়ে যাওয়া খিলান, এরও এক মাধুর্য আছে। উপলব্ধি করে সম্রাজ্ঞী, গা ছম ছম করে। মনে হয় যেন একশো ঘোড়ার খুড়ের শব্দ। কিংবা হাতির বৃংহন কানে আসছে। আর অদ্ভুত মুগ্ধতা বিলিয়ার্ডের টুক টুক শব্দে। আর ক্রিকেট মাঠে পতৌদির নবাবের আগমন রাজনগরকে সত্যিই রাজার শহর বানিয়ে দিয়েছিল। লক্ষ লক্ষ শিল্পী নিশ্চয়ই কাজ করেছে এ খিলান তৈরিতে, গম্বুজের অদ্ভুত কারুকাজে। সুনীতি দেবীর স্মৃতির সঙ্গে ভেসে যায় ওরাও। শোনা যাচ্ছে কয়েকবছরের মধ্যেই রাজবাড়ির ঘরগুলোকে মিউজিয়মে পরিণত করবে কর্তৃপক্ষ। অস্ত্রশস্ত্র দেখা যাবে, সাজানো হবে সব। কিন্তু মনের মধ্যে খটকা থেকেই যায়, স্বাভাবিক থাকবে তো সবটুকু! তখন কি আলটপকা হাত ধরাধরি কোনও তরুণ তরুণী পাখির মত কলকলিয়ে উঠবে রাজবাড়ি ঘেঁষা পুকুর ধারে! অথবা, রাজবাড়ি সংলগ্ন ভাঙা মন্দিরে বেজে উঠবে ঘণ্টা! কেমন বিমর্ষ লাগে রাণীর। নীরা, উৎপল হৈ হৈ করে আবার। ঘুরতে ঘুরতে ঘুর ঘুরুনি খেলার ইচ্ছে হয়। বাবা যেমন বলে, তুইতো সেই রানিই, বড় তো হোস নি একটুও। ...বড় হয়েছিস মনে করলে কিন্তু বুড়ো হয়ে যেতে হয়! সম্রাজ্ঞী তাই বুড়ো নয়। যৌবনের দূত, ঠিক মহারাণীর মত। ...আবার কানের কাছে সুনীতির স্বরে কে বলে ...এ যেন আকাশবাণী। 'অনেক দেশ ঘুরেছি আমি, কিন্তু হাজার হাজার জোনাকির মেলা অন্য কোথাও দেখিনি। তমসাচ্ছন্ন রাতে মাঠে মাঠে আকাশের তারার মত এগুলি মিট মিট করে জ্বলত। বর্ষাকালে বন্যায় অনেক নদীর দুকূল ছাপিয়ে যেত। তখন কোচবিহার শহরকে আমার ভেনিস শহর মনে হত।'

প্রচণ্ড শব্দ করে বিনা মেঘে বজ্রপাত হল। চমকে উঠেছিল ওরা। একে অন্যকে জড়িয়ে ছিল, হাতে হাত।

সুনীতির ইংরেজ সেবিকা এলড্রিন এসময় বলে উঠতেন, 'বহু দেশ আমি ঘুরেছি, কখনও কোথাও এমন বজ্রপাত দেখিনি।'

আসলে রাজনগরের আত্মার আত্মীয়রা অনুভব করেন, ওনারা আছেন। এখনও শোনা যায় ওদের সে রাজকীয় পদভার। রাজকীয় মেলার গঠনে মহিলা কণ্ঠের খিল খিল হাসি কেমন আচম্বিতে মহাদেবের রাজত্বে নিয়ে যায়। সেবিকা এলড্রিন, মহারাণীর ছেলে মেয়েদের দেখে রাখার কাজে ছিলেন, গভর্নেস।

সুনীতিতে তিনি ছিলেন অনুরক্ত। হেসে সেকথা জিজ্ঞেস করলেই এলড্রিন অকপটে বলত, হে মহারাণী, যখন তোমার কাজে যোগ দিই, আমার ধারণা ছিল, তুমি হবে স্থুল, কৃষ্ণকায়, অশিক্ষিত একজন। এখন বলতে দ্বিধা নেই, তোমাকে দেখে আমি এত বিস্মিত হয়েছি যে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছি না! রাজরাণী হলেও সম্রাজ্ঞীর ভাবতে ভাল লাগে, কোনও আত্মম্ভরিতায় বড় করেন নি সন্তানদের। নিজেও সহজ ছিলেন, অত্যন্ত কাছের মানুষ। সকালে স্নান সেরে উপাসনা ঘর নিজে হাতে সাজাচ্ছেন মহারাণী, এ ছবি প্রতিদিন যেন মানস চোখে দেখে সম্রাজ্ঞী ভোরের আলোয়। সাদা মার্বেল পাথরে তৈরি বেদী ও মেঝেতে অসংখ্যা গোলাপ জুঁই আর উজ্জ্বল রঙের ফুলগুলি সৌন্দর্য তৈরি করেছে। মহারাণী ভাসছেন অসীম সুখ সমুদ্রে। নির্মল বাতাসে পবিত্র হয়ে উঠছেন বার বার।

আজ উৎসবে, নাটকের আগে, মহারাণীর ট্যাবলো, নাটকের প্রসঙ্গ উঠেছিল আলোচনায়। শুধুমাত্র রাজকর্মচারী ও অন্যান্যদের মনোরঞ্জনের জন্য মজা করতেন মহারাণী। আঁকতে ভালোবাসতেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা জানলা দরজার কাচে কারুকার্যময় অলঙ্করণ করতেন মহারাণী। এখনও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কিছু রঙের আভাস কি পায় ওরা...রানির বন্ধুরা...?

আচ্ছা, মনখারাপ করে ওঠা মানে কি সৃষ্টির বীজ ঘুমিয়ে থাকা বুকের ভেতর, অগোচরে চলে যাওয়া মানুষগুলোর জন্য কি কান্না লেগে থাকা! হয়ত, আজ সারাদিন সন্ধে রাত ওরা সবাই যেন উড়ে বেড়াল। দাঁড়াল এসে পৌরসভার অতিথি নিবাসের সামনেটায়। সাগরদীঘির পাড়ের কানাকানি শেষ। আচ্ছা, ভালবাসাগুলো ভেঙে ভেঙে যায় কেন! কেন সমুদ্রে ওঠে টান! হালকা কথার ভিতর শরীর ভাল হওয়ার রসদ লুকিয়ে আছে।

রাজীবও বাড়িতে থাকলে একা বিষণ্ণ সময় কাটিয়ে ওঠে রানির কলকলানিতে। আর অজস্র বই, ম্যাগাজিনের পাহাড় নিয়ে নিজের প্রকাশিত লেখাগুলো সরিয়ে রাখে। সেসব জমিয়ে একখানা বই করার বাসনা কবে থেকে লুকিয়ে রাখা। কাকে বলবেন! কে খরচ যোগাবে, কে দৌড়বে মহানগরীর অন্ধিসন্ধি, কাকে বিশ্বাস করে অতি যত্নের পাণ্ডুলিপি ধরিয়ে দেবেন!

থাক, মেয়েও বড় হল, লিখছেও বেশ। ওকে উৎসাহ দেওয়ার মধ্যেই নিজের ভালবাসার রাজনগর কথা ভেসে বেড়াতে থাকে। যা কি না নামকরা পত্রিকায় প্রতিমাসে বেরিয়েছে 'রাজনগর কথা' নামে। সন্ধে হয়ে এল, শঙ্খ, ঘণ্টা ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সে সব তুলে রাখা পৃষ্ঠায় হাত বুলিয়ে নেয় রাজীব। সবার অলক্ষ্যে। সম্রাজ্ঞী তখনও ফেরে নি। সময় হয় নি। সোহাগিনী দু'কাপ চা হাতে এক বাটি মুড়ি মেখে এসে দাঁড়াবেন সন্ধে প্রদীপ দেখানো হয়ে গেলে। রানিকে এবার ছাড়তেই হবে দূরে, অসংখ্য যোজন দূর। পড়বে আর জানবে... আর ও লিখবে, ডিগ্রি নেবে, কলেজের ম্যাডামের চোখে লেগে থাকবে কালো ফ্রেমের চশমা। লম্বা বিনুনিতে রানি হয়ে উঠবে ঈশ্বরী।

...ইস আজ যা আনন্দে কাটালাম! বাবা... ভাবতেই পারবে না। হৈ হৈ করে প্রায় বিছানায় বাবার শরীরে লেপ্টে যায় রানি। সোহাগিনী রৈ রৈ করে ওঠে ...কী ব্যাপার! বাইরে থেকে এসে হাত-পা কিচ্ছুটি ধোয়া নেই এক্কেবারে বিছানায়! পারও তুমি, বলতে পারো না ওকে! ততক্ষণে বাবার কোলের ভিতর মুখ লুকিয়ে কোনও ব্যথা গোপন করে না তো মেয়েটা!....

গৃহকোণ ছাড়ার ঘন্টি বাজছে, মা কি বোঝে না? বোঝে ঠিক বোঝে। তা না হলে আঁচলের খুটে চোখ মুছে নেয় কেন বার বার!

ঘরের সামনে সন্ধে মালতীর ঝাড়ে সন্ধেয় ঘরে ফেরা পাখিগুলো ডাক দিয়ে যায়, আবার মন কেমন করে রানির। এই মানুষের জন্য! সকলের জন্য এত ভালবাসাবাসি যাদের, প্রবল বিরাট কলজে জুড়ে মহৎ কাজ করার বাসনা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে যারা তারা কষ্ট পায় কেন বাবা? ...কেন, কী হল? ...ওই যে তোমার রবীন্দ্রনাথ, শূন্যি হলেন হারালেন সব, আবার আমার সুনীতি দেবী... যে ভালবাসা ছিল তার জীবন, যে অনুভব শরীর মনে নিয়ে দৌড়ে বেরিয়েছেন, সৃষ্টি করেছেন, তাকে কত সহ্য করতে হল বল!

—হ্যাঁ রানি, মানুষের প্রতি মুহূর্ত কি একরকম যাবেই? হয় না তা। মানুষ থাকে না, প্রিয় মানুষ। হাত বাড়ানো মানুষেরা, আঙুল ছুঁয়ে থেকে থেকে একদিন কোথায় যে চলে যায়! আর যে কাজের ভার নিয়ে পড়ে থাকে, তাকে তো সবটুকু নিয়ে চলতেই হবে শেষ পর্যন্ত... সমস্ত ভার সর্বময় কর্তাকে দিয়ে, মনখারাপ ধুয়ে ধুয়ে আলো হয়ে যেতে হয়।

...ইস কী সুন্দর বললে বল। আর আমারও ভর্তি কিন্তু আগামী সপ্তাহেই। রবীন্দ্রভারতী, যাদবপুর দুটোতেই নাম আছে, সুনীল মামা দেখে জানিয়েছে। সুমন, নীরা, সুদীপা ওদেরও অন্যান্য কলেজে উঠেছে। তবে, আমি হোস্টেল পেয়ে যাব মনে হচ্ছে। রাজীব খুশির হাসিতে ভরে দিলেন যাবতীয় মন খারাপ। মনের অন্ধকার যত বাড়তে দেবেন সে তো শূন্যই করে দেবে বার বার। মেয়ে থাকবে না, এত জানাই। এত সত্যি বড়ই আনন্দের তাহলে! এত ভাবছে কেন? প্রতিদিনের চিঠিই মন খুশ করে দেবে। জমিয়ে চা-মুড়ির জমাটি আড্ডায় সুর তোলে রাজীব। ...আমার যা আছে আমি সকল দিতে পারিনি তোমারে নাথ.../ আমার লাজ ভয় মান অপমান সুখ দুখ ভাবনা...

শেষ অংশটায় কেমন আনন্দে বিহ্বল স্বর তিনজনেরই। চায়ের কাপ তখন শূন্য শেষ মুড়ির বাটি, পা বাড়ানো মেয়েটা তখন স্বপ্ন কথা বলে... রাজনগরের মাটির ঘরে ঘরে তখন সন্ধে প্রদীপ।

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

যে শরীর ডাউনলোড হয়

অরণ্য মিত্র

১

সেপ্টেম্বর ২০১৫।

ঋতমের মোবাইলে ব্যালেরিনার টেক্সটটা একটু আগেই এসেছে। আগামিকাল সকালে সে কার্শিয়ং থেকে আসছে জলপাইগুড়ি। পরশু দুপুরে চলে যাবে। তাঁদের জলপাইগুড়ির ফ্ল্যাট ঘটনাচক্রে এখন ফাঁকা। ঋতম কি আসতে পারবে?

কয়েক দিন ময়নাগুড়িতে নিজের বাড়িতে কাটিয়ে তিনদিন হল কলকাতায় এসেছে ঋতম। ক্লাস শুরু হয়ে গেছে। বান্ধবীও জুটে গেছে। ইউনিভার্সিটির থেকে পনের মিনিট হাঁটাপথে চমৎকার পরিবেশে ছেলের থাকার জন্য একটা ছোট ফ্ল্যাট কিনে ফেলেছেন বাবা স্বর্ণকমল শতপথী। ঋতম অবশ্য গ্রাজুয়েট হয়েছে ময়নাগুড়ি কলেজ থেকে। কলকাতায় পড়তে আসাটা তাঁর কাছে মূলত ফুর্তি করার জন্য। একমাত্র সন্তান হিসেবে পরিবারের ব্যবসা তাঁকেই ধরতে হবে। তার আগে যদ্দিন পারা যায় মস্তিতে কাটানই ঋতমের পরিকল্পনা।

কলকাতায় গিয়ে কোথাও ভর্তি হয়ে দু-চার বছর উদোম ফুর্তি করার পরিকল্পনটা ঋতমকে দিয়েছিল তাঁর জিগ্‌রি দোস্ত বিনায়ক। সে এবং হিমেশ দু-জনেই ঋতমের স্কুল ফ্রেন্ড। দু-জনে অবশ্য পড়াশুনোয় ঋতমের মত অমনযোগী ছিল না। ওরা স্কুল শেষ করে কলেজে পড়ার জন্য আগেই চলে গিয়েছিল কলকাতায়। ঋতম না থাকলে ফুর্তিটা যে পুরো হবে না, সেটা ওরা অচিরেই টের পায়। কিন্তু স্বর্ণকমলবাবু পরিষ্কার বলে দিয়েছিলেন যে, ছেলের লেখাপড়ায় আগ্রহ কম। কলেজ পাস করলে তারপর তিনি ভাববেন ছেলে কলকাতায় পড়তে যাবে কি না।

ঋতম অবশ্য একবারেই বিএ পাস করে গেল। ময়নাগুড়িতে স্বর্ণকমল খ্যাতিমান ব্যক্তি। অনেকের মতে তিনি সেখানকার সেরা বড়লোক। ঋতম যে কৈশোরেই নিষিদ্ধ বস্তুর আস্বাদ নিয়মিত নিতে শিখেছিল, সেটা তিনি টের পান নি। ঋতম ময়নাগুড়িতে কিছু করত না। সে যেত প্রথমে জলপাইগুড়ি। কলেজে ঢোকার পর টিউশন নেওয়ার অজুহাতে সপ্তাহে দু-দিন যেতে শুরু করল শিলিগুড়ি। ময়নাগুড়িতে কলেজে পড়াকালীন অন্তত পাঁচবার বান্ধবী পাল্টেছিল সে। প্রত্যেকের সঙ্গেই বেশ কয়েকবার মিলিত হয়েছিল। এইসব মিলন ঘটত শিলিগুড়ির হোটেলে। ঋতম একটা জিনিস ভালভাবে জেনে গিয়েছিল যে নারী আর সুরা পয়সা ফেললে পৃথিবীর সব জায়গায় মেলে।

ব্যালেরিনা গুরুং দার্জিলিং-এর মেয়ে। ঋতমের নতুন গার্লফ্রেন্ড। এখনও ব্যালেরিনার প্রতি আগ্রহ ফুরিয়ে যায় নি ঋতমের। ব্যালেরিনা তুখোর ছাত্রী। কম্পিউটরের ভাষা নিয়ে কাজ করবে। পরের বছর জুন মাসে সে চলে যাবে মার্কিন দেশে। ঋতমের সঙ্গে তাঁর আলাপ হওয়াটা অবশ্য আকস্মিক ছিল। জলপাইগুড়িতে একটা বড়সড় ফ্ল্যাট কিনে রেখেছিলেন স্বর্ণকমলবাবু। তাঁর পরিকল্পনা ছিল ছেলে ময়নাগুড়িতে ব্যবসার হাল ধরলে তিনি জলপাইগুড়িতে থাকবেন এবং রাজনীতি করবেন। তাঁর ফ্ল্যাটের ঠিক মুখোমুখি দরজাটা ছিল ব্যালেরিনার তুতো দাদা-বৌদির ফ্ল্যাট। আসলে জলপাইগুড়িতে তাঁদের বেশ কয়েকজন

আত্মীয় থাকেন।

সেই আবাসনেই একদিন সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ব্যালেরিনার সঙ্গে পরিচয় ঋতমের। এত ঝকঝকে মেয়ে সে আগে দেখে নি। ব্যালেরিনার দাদা-বৌদি অবশ্য সুযোগ পেলেন বিজনবাড়ি চলে যান। ব্যালেরিনা এখন পড়ছে শিলিগুড়িতে। জলপাইগুড়িতে সে মাঝে মাঝে আসে অধ্যাপক আলফ্রেড উইগনেস্টাইনের সঙ্গে দেখা করার জন্য। এই ইহুদি কম্পিউটর বিশেষজ্ঞ ইউনেস্কোর হয়ে ডুয়ার্সে কোনও একটি প্রোজেক্টে কাজ করছিলেন তখন। থাকতেন সার্কিট হাউজে। ব্যালেরিনার সঙ্গে তাঁর আলাপ ইন্টারনেট সূত্রে।

ব্যালেরিনার সঙ্গে তাঁর দাদার ফাঁকা ফ্ল্যাটে দু-বার মিলিত হয়েছে ঋতম। ব্যালেরিনা তাঁর পরিবার সম্পর্কে সবই জেনেছে। ঋতমকেও জানিয়েছে তাঁর বিষয়ে তথ্য। সে সম্পর্ক রাখায় বিশ্বাসি। তাঁর মনে হয়েছে, ঋতমকে বিশ্বাস করা যায়। কে কতটা লেখাপড়া জানে, সেটা তাঁর বিবেচনায় গৌণ।

ঋতম কিন্তু আদৌ কোনও স্থায়ি সম্পর্কের কথা ভাবে নি। এখনও ভাবে না। যখন সে ব্যালেরিনার প্রয়োজন আর অনুভব করবে না, তখন সে সরে যাবে। ব্যালেরিনা তাঁকে ভালবাসা আর বিশ্বাস নিয়ে কিছু বললে সে মনে মনে হাসত। বোঝার চেষ্টা করত যে তাঁর প্রতি এমন একটা ঝকঝকে মেয়ের এত ভরসা কেন? মেয়েরা সত্যিই ভালবাসায় অন্ধ হয়ে যায়?

ব্যালেরিনার বার্তা পাওয়ার পর থেকে ঋতম চিন্তা করে যাচ্ছিল কী ভাবে কাল জলপাইগুড়ি পৌঁছানো যায়। বিছানায় সে খুব সাবলীল। ঋতম সেটা বেশ পছন্দ করে। কলকাতায় বান্ধবী যারা জুটেছে তাঁদের কাউকে নিয়ে ফ্ল্যাটে রাত কাটাতে এখনও সময় লাগবে। সব মেয়ে এক রকম হয় না। ভুল জায়গায় রাত কাটাবার প্রস্তাব দিলে কলকাতার মেয়েরা নাকি চড়-থাপ্পর লাগিয়ে দেয়। সুতরাং শরীরের তাপ বিনিময়ের জন্য ব্যালেরিনার আকস্মিক প্রস্তাবটা ঋতমকে টানছিল।

এখন প্রায় সন্ধে। কাল জলপাইগুড়িতে পা রাখার একমাত্র উপায় ফ্লাইট। কিন্তু খরচ ভালই পড়বে। কালকের রাতটা ব্যালেরিনার সঙ্গে কাটিয়ে পরশু আবার উড়েই ফিরতে হবে তাঁকে। কারণ সেদিন সন্ধেবেলায় বিনায়কের পার্টি। ইদানিং মহানগরের প্রথম সারির দু-একজন এসকর্ট গার্ল সে পার্টিতে আসবে। পার্টি মিস করা যাবে না। বাবাকে বলে প্লেনের ভাড়া আদায় করার উপায় নেই। সদ্য বাড়ি থেকে ফিরেছে সে। কী এমন জরুরি কাজ দেখাবে যার জন্য একগাদা খরচ করে উড়ে আসতে-যেতে হবে তাঁকে?

অনেক ভেবে ঋতম লিখল, ক্যান ইউ প্লিজ বুক মাই এয়ার টিকিট হানি?

আধঘণ্টা কোনও উত্তর নেই। তারপর বার্তা এল, টিকিট সেন্ট টু ইওর মেইল। ব্রিং কন্ডোম উইদ ডট্।

২

ব্যালেরিনা উপোষ করে ছিল। সেই রাতে তাঁর উপোষ ভঙ্গ করল ঋতম। এক দীর্ঘস্থায়ী, উদ্দাম মিলনের শেষে ব্যালেরিনা ঘুমিয়ে পড়ল। তাঁর ঘুমন্ত, নগ্ন দেহটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঋতমের মনে হচ্ছিল, এই দেহটা তাঁর আরও চাই। ব্যালেরিনা বিদেশ চলে যাওয়ার পর শরীরটাকে ভুলে যাবে সে। কিন্তু পরদিন সকালে ব্যাকপ্যাক নিয়ে ঋতম যখন ব্যালেরিনাকে বিদায়ি চুম্বন দিল, তখন সে মৃদু অথচ গভীর স্বরে জিগ্যেস করল, 'আমি তাহলে বাড়িতে জানাই?'

ঋতম কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে জবাব দিয়েছিল, 'তুমি স্টেটসে চলে যাবে। তারপর অনেক কিছুই হতে পারে। ততদিন পর্যন্ত কোনও কমিটমেন্ট যাওয়া কি উচিত হবে?'

'তুমি কি অন্য কিছু ভাবছ ঋ?'

'বিয়ে নিয়ে এখনই কি ভাবার কিছু হয়েছে?'

'দেন হোয়াই ডিড ইউ ফাক্?'

একটি মেয়ে এসে অ্যাডাল্ট গেম-এর ডেমোনেস্ট্রেশন দেবে— এটা ঋতমের কাছে বেশ নতুন ব্যাপার। অ্যাডাল্ট গেম নিয়ে সম্প্রতি তাঁর একটু কৌতূহল জন্মেছে। ব্যাপারটা একদিন ফোনে গল্প করার সময় হিমেশই ঢুকিয়েছিল ঋতমের মাথায়। কিন্তু এদেশে বসে নাকি ভাল গেম কেনা যায় না। কী ভাবে সে সব যোগাড় করা যায়, তা নিয়ে গল্প হচ্ছিল। হিমেশই বলছিল। তবে হাইফাই অ্যাডাল্ট গেম-এর মজা যেমন খরচও নাকি মন্দ নয়। হিমেশের মতে, গেম খেলার চেয়ে জ্যান্ত মেয়ে নিয়ে খেলা মানি সেভিং।

'তুমি বুঝি এনজয় করো নি?'

ব্যালেরিনা স্থির চোখে তিন-চার সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে জবাব দিয়েছিল, 'তোমার সব মেসেজ, হোয়াটস অ্যাপ আমি স্টোর করে রেখেছি আমাদের রিলেশনের স্মৃতি হিসেবে। আই উইল সেন্ড অল দোস টু ইওর ড্যাড।'

ঋতম একদম উত্তেজিত হয় নি সে কথা শুনে। অসামান্য অভিনয় করেছিল বরং। গলায় ধরা ধরা ভাব এনে সে বলেছিল, 'আই ওয়জ জাস্ট টেস্টিং ইউ হানি! আফট্রল ইউ আর ফার বেটার দ্যান মি। আমার ভয় হয় তুমি আমাকে রাখবে কি না।'

ব্যালেরিনা বিশ্বাস করেছিল। সে প্রবল আবেগে জড়িয়ে ধরেছিল ঋতমকে। প্রায় আরও একবার মিলন হতে যাচ্ছিল, কিন্তু ব্যালেরিনা নিজেকে সামলে নিয়ে ঋতমকে চুম খেতে খেতে বলেছিল, 'ইউ মে মিস ইওর ফ্লাইট। আই উইল কাম টু দিস ফ্ল্যাট সুন।'

তখনকার মত সামাল দিয়ে কলকাতা ফিরে এসেছিল ঋতম। কিন্তু সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেলেছিল উড়তে উড়তেই। বিনায়কের পার্টিতে সে চুপচাপ থাকল। পার্টির শেষে হিমেশ আর বিনায়ক যখন তাঁর অফ মুডের কারণ জানার জন্য চেপে ধরল, তখন ঋতম জানাল ব্যালেরিনার হুমকির কথা। শোনামাত্র ওদের মুখ গম্ভীর হয়ে যায়। আলোচনা শুরু হয়। শেষ রাতে হিমেশ মন্তব্য করে, 'ঋতমের ফ্যামিলিকে সব বলা মানে আমাদের ফ্যামিলিকেও বলা। বাড়িতে জানলে আমাদের বিয়ে দিয়ে দেবে ইয়ার! ব্যালেরিনা ইজ রিস্ক।'

'রাইট! দেন উই শুড কন্টাক্ট উইদ রাধু মাহাত।'

রাধু মাহাত একজন পেশাদার খুনি। শার্প শুটার। ওয়ান শটার ব্যবহার করে। সেটা সে বানায় নিজে। মিস্ নেই।

প্ল্যান অনুযায়ি ঋতম তাঁর তুতো দিদির মাধ্যমে মা-কে জানিয়ে দিল যে সে একজনকে ভালবাসে। নাম ব্যালেরিনা। মা খুশি হলেন। স্বর্ণকমলবাবু অখুশি হলেন না। পরের তিনমাস ব্যালেরিনার সঙ্গে টেলিফোনে মা-এর আলাপ হয়ে গেল। তুতো বোন-দিদিরাও ভাব জমাল ব্যালেরিনার সঙ্গে। ঋতম নিজেও হোয়াটস অ্যাপ কি ভিডিও কলে কিংবা ফোনে দুর্লভ দক্ষতার সঙ্গে করে গেল প্রেমের অভিনয়। ব্যালেরিনা জানাল ক্রিসমাসে সে জলপাইগুড়ি আসছে। বলা বাহুল্য ক্রিসমাসের ছুটিতে দাদা-বৌদি চলে যাবেন বিজনবাড়ি।

২৫শে ডিসেম্বর সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ কার্শিয়ং থেকে শিলিগুড়ির তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসে পা রেখেছিল ব্যালেরিনা। ঋতম ছিল ময়নাগুড়িতে। দশটা আটত্রিশে ফোন করে ব্যালেরিনা তাঁকে জানায় সে এখুনি জলপাইগুড়ির বাস ধরবে। ঋতম জবাবে বলেছিল, 'আই উইল রিচ বাই ফাইভ।'

সাড়ে বারোটা নাগাদ ব্যালেরিনা যখন বাস থেকে নামল, লোকজনের মধ্য থেকে দুটো ছেলে এগিয়ে এল তাঁর দিকে। ব্যালেরিনা তাঁদের দেখে অবাক হয়ে বলল, 'আরে! আপনাদের তো চিনি।'

বিনায়ক হাসতে হাসতে বলল, 'ফোটোতে দেখেছেন। কে কোনটা বলুন তো?'

'ইউ বিনায়ক এন্ড হি ইজ হিমেশ।' বলে হাত মিলিয়েছিল ব্যালেরিনা।

'আসলে, আপনাকে বাস থেকে নামতে দেখেই দাঁড়ালাম। চলুন নামিয়ে দিচ্ছি।'

'ঋতম শুনলে খুশি হবে।'

'এখন ফোন করার দরকার নেই।' হিমেল হাসিমুখে বলেছিল। 'আমাদের জ্বালিয়ে মারবে ফোনে। নেমে যাওয়ার পর ফোন করবেন।'

'আই আন্ডারস্ট্যান্ড।'

ব্যালেরিনা হালকা মনে উঠে বসেছিল এসইউভি-তে। হিমেশ তাঁর পাশে বসল। গাড়ি চালাচ্ছিল বিনায়ক। বড় রাস্তা ছেড়ে নির্জন গলিপথ ধরতেই হিমেশ আচমকা একহাতে ব্যালেরিনার কাঁধ জড়িয়ে অপর হাত ঠেসে ধরল তাঁর মুখে। সে হাতে একটা রুমাল ছিল। হতভম্ব ব্যালেরিনা সব কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিল কিছুক্ষণের জন্য। তাঁর ঘুমন্ত শরীরটা নিয়ে গাড়িটা শহর ছাড়িয়ে গিয়ে থেমেছিল একটি নির্মিয়মান হিমঘরের পেছনে। সেখানে রাধু মাহাত উপস্থিত ছিল। তাঁর কাজ ছিল ব্যালেরিনার হাত-পা-মুখ বেঁধে একটা একটা ছোট ট্রাকে তুলে নিয়ে চলে যাবে পাঙ্গা নদীর ধারে একটা ছোট জঙ্গলে। সেটা বিনায়কদের পরিবারের সম্পত্তি। রাধু ব্যালেরিনাকে খতম করে কোথাও ফেলে দেবে।

আসলে বাস স্ট্যান্ডের মত জায়গায় শুট করতে চায় নি রাধু। সে বলেছিল, কোথাও এনে দিন। বাকি দায়িত্ব আমার।

কিন্তু প্ল্যানের বাইরে একটা জিনিস হল। ব্যালেরিনাকে যখন হিমঘরে আনা হল, তখন তাঁর জ্ঞান ফিরছে। হিমেশ একবার রসিকতা করে ঋতমকে বলেছিল, 'যখন তুই স্যাটিসফায়েড হবি তখন একবার ব্যালেরিনাকে আমার ঘরে পাঠাস।'

সেটা নেহাৎ মজার কথা ভেবে তুমুল হেসেছিল ঋতম। বিনায়ক হাসে নি। পরে সে হিমেশকে বলেছিল, 'এ জিনিস জীবনে আর মিলবে না ইয়ার! প্ল্যানে এক্সট্রা আইটেম ঢোকাও। ঋতমকে বলার দরকার নেই।'

ব্যালেরিনার মাথার সামনে ওয়ান শটার ধরে তাঁকে ধর্ষণ করেছিল বিনায়ক আর হিমেশ। এতে রাধুর সুবিধে হয়েছিল। প্রায় জ্ঞানহীন, ক্ষতবিক্ষত ব্যালেরিনাকে অনায়াসে হাতমুখ বেঁধে ট্রাকে তুলতে বেগ পেতে হয় নি। পুলিশ চারদিন পর ব্যালেরিনার মৃতদেহ খুঁজে পেয়েছিল প্রায় বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে।

এরপর ঋতমকে দেখা গেল ভেঙে পড়তে। ময়নাগুড়িতে এই মর্মান্তিক ঘটনা নিয়ে কয়েক দিন আলোচনা হল। ঋতমের প্রতি সহানুভূতিশীল মানুষের অভাব হল না। ঋতমের পরিবার শোকে মুহ্যমান হয়ে থাকল কয়েক দিন। স্বর্ণকমলবাবু সিদ্ধান্ত নিলেন যে ছেলে এখন থেকে কলকাতাতেই থাকবে।

ব্যালেরিনা হত্যার কিনার হয় নি। হিমেশ আর বিনায়ক তাঁদের মোবাইল রেখেছিল আরেকটা গাড়িতে যেটা পার্ক করা ছিল একটি পার্কের সামনে। পুলিশ জিগ্যেস করলে তাঁরা বলত, পার্কে গিয়েছিল জাস্ট হাওয়া খেতে। কিন্তু পুলিশ তাঁদের জেরা করে নি।

৩

মার্চ, ২০১৯।

বছরখানেক হল কলকাতার পাট চুকিয়ে ময়নাগুড়িতে এসে পারিবারিক ব্যবসায় মন দিয়েছে ঋতম। হিমেশ আর বিনায়ক আগেই ফিরে গিয়েছিল। দু-জনেই শিলিগুড়িতে ব্যবসা চালু করেছে। বন্ধুত্ব অটুট থাকলেও ইদানিং দেখাসাক্ষাৎ হয় না বললেই চলে। শোনা যাচ্ছে হিমেশের নাকি বিয়ে প্রায় পাকা। বিনায়কের একটা প্রেম চলছে।

নারী শরীরের প্রয়োজন হলে ঋতম চার-পাঁচদিনের জন্য মুম্বই চলে যায়। সেখানে একটা এজেন্সির সঙ্গে হিমেশ পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল ফোনে। তাঁদের হাতে শরীরের অভাব নেই। এতে খরচ একটু বেশ হলেও ঝুঁকি নেই। বিলাসবহুল ফ্ল্যাট তাঁরাই দিন হিসেবে ভাড়া দেয়। ঋতম আদৌ বিয়ের কথা ভাবছে না। বাড়ি থেকেও চাপ দেওয়া হচ্ছে না কোনও।

ঋতম ক্যালেন্ডার দেখছিল। ভোটের হাওয়া এখনও জমে নি। দোলের সময়টা মুম্বইতে অভিলাষার সঙ্গে কাটান যায় কি না ভাবছিল। অভিলাষা পাটানি এজেন্সির দেওয়া এক যৌনবোমা বিশেষ। সার্ভিসে কোনও ত্রুটি নেই। কাস্টমার পছন্দ না হলে দ্বিতীয়বার সে কাস্টমারকে আর নেয় না অভিলাষা পাটানি। ঋতমের ব্যাপারে অবশ্য গ্রিন সিগন্যাল দিয়েছে এজেন্সির কাছে। কিন্তু অভিলাষা কি হোলিতে ফ্রি থাকবে।

ঋতম এজেন্সিকে ফোন করবে ভাবল। তখনই ফোনটা বেজে উঠল তাঁর। অচেনা নম্বর। ফোনটা ধরে সে একটু বিনয়ের সুরে বলল, 'ঋতম বলছি।'

'স্যার, আমি একটি গেম কোম্পানি থেকে নয়না রবাবী বলছি।'

গলাটা ইন্টারেস্টিং। ঋতম একটু লঘু সুরে বলল, 'গেম্? হোয়াট কাইন্ড অফ গেম্? তোমার কি মনে হয় আমার গেম খেলার বয়স আছে?'

'উই প্রোডিউজ অ্যাডাল্ট গেমস্ স্যার। ইউ ক্যান প্লে ফর ফিউ উইকস্ ফ্রি অফ কস্ট। ইফ ইউ আর স্যাটিসফায়েড ক্যান বাই।'

'দেন সেন্ড মি দ্য লিঙ্ক।'

'ইট নিডস্ আ ডেমোনেস্ট্রেশান স্যার। আই উড লাইক টু মিট ইউ। আপনি কি ময়নাগুড়িতেই আছেন এখন?'

'আপনি কোথায় আছেন?'

'জলপাইগুড়ি স্যার। আপনি চাইলে আজকেই ডেমো দিতে পারি।'

একটি মেয়ে এসে অ্যাডাল্ট গেম-এর ডেমোনেস্ট্রেশন দেবে— এটা ঋতমের কাছে বেশ নতুন ব্যাপার। অ্যাডাল্ট গেম নিয়ে সম্প্রতি তাঁর একটু কৌতূহল জন্মেছে। ব্যাপারটা একদিন ফোনে গল্প করার সময় হিমেশই ঢুকিয়েছিল ঋতমের মাথায়। কিন্তু এদেশে বসে নাকি ভাল গেম কেনা যায় না। কী ভাবে সে সব যোগাড় করা যায়, তা নিয়ে গল্প হচ্ছিল। হিমেশই বলছিল। তবে হাইফাই অ্যাডাল্ট গেম-এর মজা যেমন খরচও নাকি মন্দ নয়। হিমেশের মতে, গেম খেলার চেয়ে জ্যান্ত মেয়ে নিয়ে খেলা মানি সেভিং।

অ্যাকচুয়ালি উই বিলিভ দ্যাট দিস কাইন্ড অফ গেমস্ ক্যান রিডিউজ মেল'স সেক্সচুয়াল আর্জ। ভার্চুয়াল রেপ অর অ্যাবিয়ুজ বেটার দ্যান রিয়াল। সত্যি বলতে কি স্যার, ছেলেরা হল পলিগামিস্ট। সব ছেলের মধ্যে এক ধরনের সেক্সুয়াল পারভার্শন থাকে। সেটাকে রিলিজ করে দেওয়াই গেমস্-এর কাজ। এটা সেক্স সাইকোলজিস্টরা সাপোর্ট করেন। এখানে স্যার আপনি একটা ফিমেল কাস্টমাইজ করতে পারেন। এমন কি, আপনি কোনও মেয়ের ফোটোগ্রাফ দিলে আমরা হাফ এন্ড আওয়ারের মধ্যে তার মত দেখতে একটা মেয়ে আপনাকে পাঠিয়ে দেব। আপনি সেই ফিগারের স্ট্যাটিক্স নিজের মত করে নেবেন। দিস ইজ ইউনিক গেম স্যার।'

সত্যি সত্যি ঘণ্টা দেড়েক পর নয়না রবাবীর ফোন এল, 'স্যার। আমি ময়নাগুড়ি নামলাম। কাইন্ডলি যদি লোকেশানটা বলেন।'

বেশ খানিকটা কৌতূহল মনে চেপে রেখে ঋতম ঠিকানটা বলে অপেক্ষা করতে লাগল। দশ মিনিটের মাথায় একটা টোটো এসে থামল তাঁর বাড়ির সামনে। জিনস আর শার্ট পরা একটি ছিপছিপে মেয়ে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে দারোয়ানকে জিগ্যেস করে বাড়ির ভেতরে ঢুকল সহজ ভঙ্গিতে। তারপর পাথর বিছান রাস্তাটা ধরে হেঁটে আসতে লাগল গাড়ি বারান্দার দিকে। দোতলার ব্যালকনি থেকে সেই হাঁটার ছন্দ মন দিয়ে দেখছিল ঋতম। এই রকম মেয়েরা অ্যাডাল্ট গেম বোঝাতে আসছে। কোম্পানির বুদ্ধি আছে বটে!

নিচতলায় বসার ঘরে মেয়েটি ঋতমের মুখোমুখি বসে ব্যাগ থেকে ল্যাপটপ বের করে অন করল। তারপর হাসিমুখে বলল, 'স্যার, এই ধরনের গেমস্ সম্পর্কে আপনার আইডিয়া নিশ্চয়ই আছে?'

'সামান্য। আমি কখনো খেলিনি। জাস্ট শুনেছি।'

'আমরা যে গেমটা আপনাকে ডেমনেস্ট্রেট করব, সেটা হাই এন্ডিং থ্রিডি গ্রাফিক্সের শেষ কথা। ইউ ক্যান ডু এনিথিং উইদ আ কাস্টমাইজড ফিমেল বডি। ভেরি সিম্পিল টু প্লে। তবে আপনার ডিভাইস পাওয়ারফুল হওয়া দরকার।'

'দেখি ব্যাপারটা।'

নয়না রবাবী ল্যাপটপের গেম চালু করে বোঝাতে লাগল। ইচ্ছে মত ভাইটাল স্ট্যাটিক্সের নারী শরীর জেনারেট করে তাঁকে হরেকরকম ভাবে ইউজ করা যায়। নয়না যা দেখাল, তা অবশ্য ছোট ছোট স্যাম্পেল। মূল অ্যাপ্লিকেশনটা ব্যবহার করলে পুরোটা খেলা যাবে ফ্রি-তে কয়েক সপ্তাহের জন্য। ঋতম ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বিস্মিত হল।

'কেমন লাগল স্যার?' নয়না এক সময় গেম বন্ধ করে দিয়ে বলল।

'এক্সেলেন্ট! অ্যাপ্লিকেশন কী ভাবে পাব?'

'আপনি এই গেম একা খেলতে পারেন আবার মাল্টিপ্লেয়ার অপশনেও খেলতে পারেন। সেক্ষেত্রে আপনাকে ফ্রেন্ড বাছতে হবে এবং তাঁদের কাছেও গেম থাকতে হবে। আপনি চাইলে আপনার ফ্রেন্ডকে আমরা ডেমনেস্ট্রেট করব।'

'সে খেলাটা কী ভাবে হবে?'

'সিম্পল। মনে করুন একটা মেয়ে জেনারেট করে আপনার ঠিক করলেন তাঁকে জঙ্গলে তাড়া করে ধরবেন। সেটা করতে পারেন। তারপর আপনাদের ইচ্ছেয় গেম চলবে।'

'গেম কি ডাউনলোড করতে হবে?'

'ইয়েস স্যার। তবে আমরা আপনাকে একটা এক্সেটেনশান ফাইল মেইল করব। নাউ ইউ টু নো দ্য স্পেশাল ফিচার অফ দিস গেম।'

'সেটা কী?'

'গেমের প্রতিটা স্টেপ যখন শেষ করবেন। আই মিন টু সে— আপনার জেনারেট করা মেয়েটাকে যখন ফাইনালি এনজয় করবেন, তখন আপনার একটা ফিলিং হবে। সেটা জাস্ট লাইক ইউ আর মেকিং লাভ। ফাইনালি ইউ উইল বী কামিং।'

মেয়েটা বলে কী? ঋতম অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। নয়না রবাবী ল্যাপটপ ব্যাগে ঢোকাতে ঢোকাতে মিষ্টি হেসে বলল, 'আমাদের কোম্পানির হাত ধরেই ইন্ডিয়াতে প্রথম সুপিরিয়র কোয়ালিটির পর্ন গেম লন্চ করছে স্যার।'

'আমার নাম্বার পেলেন কোথায়?'

'আজকালকার দিনে নাম-নাম্বার আর অ্যাড্রেস যোগার করা কোনও সমস্যা নয়। এর বেশি আর কোনও ইনফর্মেশন আমাদের কোম্পানি নেয় না। অ্যাকচুয়ালি উই বিলিভ দ্যাট দিস কাইন্ড অফ গেমস্ ক্যান রিডিউজ মেল'স সেক্সচুয়াল আর্জ। ভার্চুয়াল রেপ অর অ্যাবিয়ুজ বেটার দ্যান রিয়াল। সত্যি বলতে কি স্যার, ছেলেরা হল পলিগামিস্ট। সব ছেলের মধ্যে এক ধরনের সেক্সুয়াল পারভার্শন থাকে। সেটাকে রিলিজ করে দেওয়াই গেমস্-এর কাজ। এটা সেক্স সাইকোলজিস্টরা সাপোর্ট করেন। এখানে স্যার আপনি একটা ফিমেল কাস্টমাইজ করতে পারেন। এমন কি, আপনি কোনও মেয়ের ফোটোগ্রাফ দিলে আমরা হাফ অ্যান আওয়ারের মধ্যে তার মত দেখতে একটা মেয়ে আপনাকে পাঠিয়ে দেব। আপনি সেই ফিগারের স্ট্যাটিক্স নিজের মত করে নেবেন। দিস ইজ ইউনিক গেম স্যার।'

'খেলে ভাল লাগলে দু-জনকে রেকমেন্ড করব।'

'থ্যাঙ্কিউ স্যার। এক্সেটেনশান ফাইল উইল বী মেইলড উইদিন দু আওয়ার্স।'

মেয়েটা চলে গেল। ঋতম ঠিক বুঝে উঠতে পারল না যে কোনটা বেশি উদ্দীপক? গেম না নয়না রবাবী?

৪

শিলিগুড়িতে নিজের ফ্ল্যাটে বসে বিনায়ক হুইস্কি খাচ্ছিল। গরম পড়তে শুরু করেছে। দু নম্বর পেগ শেষ করার পর বিনায়ক আবিষ্কার করল তাঁর কাছে আর সিগারেট নেই। তার মানে নিচে নেমে গলির মাথায় যেতে হবে। রাত এখন প্রায় এগারটা। এখন কাছাকাছি একটা দোকানই খোলা পাওয়া যাবে। বারমুডার ওপর একটা টি শার্ট চাপিয়ে বিনায়ক মানিব্যাগটা খুঁজতে শুরু করল। সে হুইস্কি খাচ্ছিল ডাইনিং-এ বসে। পার্সটা সম্ভবত বেড রুমে রেখেছিল সে।

ফ্ল্যাটটা বড়। প্রায় হাজার দেড়েক স্কোয়ার ফিট। ডাইনিং ছাড়া বড় আলোগুলো নিভিয়ে রেখেছিল বিনায়ক। নাইট ল্যাম্প জ্বলছিল কেবল। বেড রুমে অনেক খোঁজার পর পার্সটা না পেয়ে বিনায়ক ভাবল যে টাকা কাল সকালে দিয়ে দেবে। চেনা দোকান। এটা ভাবার পর সে বেড রুম থেকে বেরিয়ে আসতেই শুনল মোবাইলটা 'টুং' করল। ঋতমের হোয়াটস অ্যাপ মেসেজ এসেছে একটা। 'গট আ ইউনিক গেম। জাস্ট ফাটাফাটি!'

হিমেশের সেক্স গেম নিয়ে আগ্রহ আছে। বিনায়ক তাঁর মুখে সে সব গেম নিয়ে অল্পবিস্তর জেনেছে। মনে হচ্ছে ঋতমও এই রসে মজেছে। কিন্তু সে লিখেছে গেম পাওয়ার কথা। একটু কৌতূহল নিয়ে বিনায়ক লিখল, সিগারেট আনতে বের হচ্ছি। একটু পরে ফোন করব।'

তখনই 'খট' করে মৃদু একটা শব্দ শুনল সে। মনে হল যেন কিছু একটা বন্ধ হল। দরজা অথবা জানলা। বিনায়ক আলতো পায়ে এগিয়ে গেল লিভিং রুমের দিকে। সবুজ নাইট ল্যাম্পের আলোয় সে ঘরে অস্বাভাবিক কিছু নজরে পড়ল না তাঁর। তাঁর ধারণায় শব্দটা এ ঘর থেকেই এসেছে।

আলোগুলো জ্বেলে দিল বিনায়ক। এবার এদিক ওদিক তাকিয়ে সে দেখতে পেল সেন্টার টেবিলের পায়ের কাছে একটা সিগারেটের প্যাকেট পড়ে আছে। তাঁর পকেট থেকে পড়েছিল? বিনায়ক তুলে নিল প্যাকেটটা। একদম নতুন। তাঁর ব্রান্ড। কিন্তু এটা এখানে এল কী ভাবে? সে যে খুব একটা সিগারেট খায়, তা না। সারা দিনে হয় তো দু-তিনটে। রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে হুইস্কি নিয়ে বসলে অবশ্য কয়েকটা লাগে।

গলির মোড়ে গিয়ে সিগারেট কেনার ঝামেলাটা আশাতীতভাবে মিটে যাওয়ায় বিনায়ক বেশি ভাবল না। সম্ভবত সে-ই কিনেছিল প্যাকেটটা। কোনও কারণে পড়ে গেছে। ব্যাপারটা মাথায় ছিল না তাঁর।

ডাইনিং-এ ফিরে এসে একটা সিগারেট ধরিয়ে চেয়ার টেনে বসল বিনায়ক। পাত্রে আরও একটু হুইস্কি ঢালল। কিন্তু চুমুক দিতে গিয়ে থমকে গেল সে। শব্দটা আবার শোনা গেল। মৃদু, কিন্তু স্পষ্ট।

বিনায়ক লাফ দিয়ে সুইচ বোর্ডের দিকে ছুটে গিয়ে সব আলো জ্বালিয়ে দিল। তারপর টেবিল থেকে একটা ভেজিটেবিল নাইফ তুলে নিয়ে সতর্ক পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে লাগল লিভিং রুমের দিকে। কোনও সন্দেহ নেই যে 'খট' শব্দটা সেখান থেকেই এসেছে। কিন্তু ঘরে স্বাভাবিক ভাবেই কাউকে দেখল না সে। লিভিং রুমের প্রতিটা আলো জ্বালিয়ে দিয়ে চারদিকে সতর্ক চোখে তাকাল বিনায়ক।

সেন্টার টেবিলটা একটু নড়ে গেছে না?

একটু আগেই যখন সে এ ঘরে এসেছিল, টেবিলটা ছিল বড় সোফাটার সঙ্গে একেবারে সমান্তরাল। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে সেই অবস্থান থেকে একটু সরে গেছে টেবিলটা।

কেমন জানি অস্বস্তি হতে লাগল বিনায়কের। নেশা চড়ে যায় নি তো? না। সে বেশ স্বাভাবিকই আছে। কিন্তু টেবিলটা সরল কী ভাবে? নাকি তাঁর ভুল হচ্ছে? চারদিক আরেকবার দেখে বিনায়ক সিদ্ধান্ত নিল, ভুল তাঁরই হয়েছে। একটু বেশি চাপ নিয়ে ফেলেছে সে। সিগারেটটা হাতেই জ্বলছিল তখন থেকে। আচমক সেটা আঙুলে ছ্যাঁকা দিতেই বিনায়ক চমকে উঠে

ডাইনিং-এ ফিরে এসে একটা সিগারেট ধরিয়ে চেয়ার টেনে বসল বিনায়ক। পাত্রে আরও একটু হুইস্কি ঢালল। কিন্তু চুমুক দিতে গিয়ে থমকে গেল সে। শব্দটা আবার শোনা গেল। মৃদু, কিন্তু স্পষ্ট। বিনায়ক লাফ দিয়ে সুইচ বোর্ডের দিকে ছুটে গিয়ে সব আলো জ্বালিয়ে দিল। তারপর টেবিল থেকে একটা ভেজিটেবিল নাইফ তুলে নিয়ে সতর্ক পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে লাগল লিভিং রুমের দিকে। কোনও সন্দেহ নেই যে 'খট' শব্দটা সেখান থেকেই এসেছে।

পুরোপুরি ধাতস্থ হল।

ফ্ল্যাটে সিওর ইঁদুর ঢুকেছে।

ডাইনিং-এ ফিরে এসে বড় একপাত্র গলায় ঢালবে ভেবেছিল বিনায়ক। স্কচের মোটা বোতলটার দিকে হাতও বাড়িয়েছিল। তখনই সে দেখল অ্যাশট্রেতে একটা আধখাওয়া সিগারেট পুড়ছে। ধোঁয়া বের হচ্ছে অল্প অল্প।

এবার বিনায়কের ভয় লাগল। এ সিগারেট সে রেখে যায় নি। একটু আগে কুড়িয়ে পাওয়া প্যাকেটটা একদম নতুন ছিল। বিনায়ক একটা সিগারেট নিয়েছিল তা থেকে। সে প্যাকেটে আধখোলা অবস্থায় টেবিলেই পড়ে আছে এবং সেদিকে তাকালেই বোঝা যাচ্ছে যে সিগারেট একটা কম!

বিনায়ক প্রায় দৌড়ে বেডরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে শুয়ে পড়ল। এসব কী হচ্ছে? সে কি পাগল হয়ে যাচ্ছে? মদ কি আর সহ্য হচ্ছে না?

চোখ বন্ধ করে প্রাণপণে বিড়বিড় করে হনুমান চালিশা আউড়ে যেতে শুরু করল বিনায়ক। তারপর মোবাইল বেজে ওঠায় প্রবল চমকাল। তবে স্ক্রিনে ঋতমের নাম দেখে একটু সুস্থ বোধ করল সে। ফোনটা ধরে বলল, 'হ্যা-হ্যালো!'

'ফোন করবি বললি?'

'হ্যাঁ মানে।'

'তোর কি কিছু হয়েছে?'

'সামথিং হ্যাপেন্ড ইন মাই ফ্ল্যাট!'

'মানে?'

'সামথিং পিকিউলিয়ার। আই গট স্কেয়ার্ড।'

'জিনিসটা কী?'

'জানি না। আমার মনে হল কিছু একটা একজিস্ট করছে।'

'মদ খেয়েছিস?'

'বেশি না।'

'ঘুমিয়ে পড়। কাল কথা হবে। গেমের এক্সটেনশন ফাইলটা তোকে মেইল করেছি। জানি না তোর ওখানে সেটা কাজ করবে কি না। নাউ গো টু দ্য বেড লাইক আ গুড কিড।'

ঋতম ফোন কেটে দিল। কিন্তু তাঁর সঙ্গে কথা বলে অনেকটা জোর ফিরে পেল বিনায়ক। দরজা খুলে বেরিয়ে প্রথমেই বড় এক পাত্র ঢেলে দিল গলায়। তারপর গট গট করে সারা ফ্ল্যাটে তল্লাসি চালাল সে।

সব কিছুই ঠিকঠাক। বোতল আর গেলাস নিয়ে বেডরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বিনায়ক মেইল লগ ইন করল। কিন্তু সেখান থেকে কিছু ডাউনলোড হল না মোবাইলে। কেবল একটা বার্তা ফুটে উঠল —'কল নয়না রবাবী ফর ডেমো। ইউ ক্যান কল এনিটাইম।'

মোবাইল রেখে দিয়ে আরও এক পেগ রেডি করে ফেলল বিনায়ক। ভয় পাওয়ার কথা ভেবে এখন তাঁর হাসি পাচ্ছে।

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

মুড়ি মাখা আর দাদু দিদুনের গল্প !

ডুয়ার্সের মেয়েবেলা

হিমি মিত্র রায়

বাবা মায়ের কাছে এসে এবার যে ক'দিন ছিলাম তার প্রতিটি দিন আমাদের বাড়ির ছাদে উঠেছি দুপুর বেলায়। প্রথম দিন এমনিই উঠেছিলাম, পরদিনগুলো কীসের টানে বারেবারে উঠেছি বুঝলাম। আমাদের ছাদ থেকে নীচে আমাদের কাকাদের, জ্যেঠুদের বাড়িগুলো দেখা যায়। বাড়ির উঠোন ঘিরে বসতি, কত স্মৃতি জড়িত এই উঠোন যার প্রতিটি ঘাস মাটির কণায় আমরা লেগে আছি। শুধু ঘরগুলোয় মানুষ হাতে গোনা এখন। ছেলে মেয়েরা সকলেই বাইরে, জ্যেঠুরা, সকলে নেই, বাড়িগুলো দেখলে মনে হয় সব ধ্বংসের অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে বসে রয়েছে।

লুকোচুরি, রংমামা রংমামা কী রং, এলেটিং বেলেটিং শৈল, কুমীর ডাঙা... আরও নাম বলে শেষ করা যাবে না। এত্ত খেলা খেলতাম সকলে মিলে। সারা বাড়ির ওলিগলি ঘুরে বেড়াতাম, তখন মায়েদের আমাদের ওপর এত তীক্ষ্ণ নজরদারি ছিল না, স্কুলে পাঠানোর আগে একথা বলতে হত না যে, কোন কাকুর কাছে যাবে না, অমুকদের বাড়িতে একা যাবে না, তমুকের কোলে বসবে না, স্কুলে কেউ গায়ে খারাপভাবে হাত দিলে বাড়িতে বলবে, আরও কত কী! ভ্যান কাকু নিজের সন্তানের মত যত্ন করে দিয়ে যেত মায়ের জিম্মায়। তারপর কোনওরকম নাকে মুখে গুঁজে ছুটতাম মাঠে। সারা পাড়ার বন্ধুরা জুটতাম সেখানে আর খেলতে খেলতে কখন যে সন্ধে নেমে আসত টের পেতাম না, রোজ কারও না কারও মা এসে তার মেয়ের বা ছেলের কান মুলত তারপর গুটিগুটি পায়ে আমরাও চলে আসতাম যে যার বাড়ির দিকে। ওই ছোট মাঠে কত্ত অনুষ্ঠান করেছি, অবাক জলপান, হিংসুটি নাটক থেকে শুরু করে নাচ, গান, আবৃত্তি কত কী!

আমার ঠাকুরদাদা আর লক্ষ্মণ মৌলিক দাদু ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী। ঠাকুরদাদাকে খুব কম দিনই দেখেছি, যদ্দিন পেয়েছি আমি অন্ত প্রাণ ছিলেন তিনি। একটার পর একটা গল্প শুনেই যেতাম, বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়তেন যখনি, আমি আবার তার চুল টেনে, আদর করে উঠিয়ে দিতাম। আবার গল্প শুরু, কত্ত যে স্টক ছিল বলার নয়! একটা লাইব্রেরি কম পড়ে যেত হয়ত তার স্টকের কাছে। আর লক্ষ্মণ দাদুর কাছে বেয়াম শিখতে যেতাম, যেতেই হত, না চাইলেও। না গেলে রাস্তায় এমন বকা দিতেন, বাড়িতে চলে আসতেন। আমরা তো শুধু কুল খাওয়ার জন্য যেতে চাইতাম। কী মিষ্টি সেই কুল যে বলার নয়। তিনটে গাছ ভরে ভরে হয়ে থাকত। পাছে ধরা পরে যাই আর বেয়াম করায় সে ভয়ে চুপিচুপি যেতাম দুপুর বেলায়, তাও কতদিন দেখে ফেলেছেন লক্ষ্মণ দাদু! আমার বাবাও কিন্তু তার ছোটবেলায় লক্ষ্মণ দাদুকে বেশ ভয় পেত, সন্ধেবেলা বেশিক্ষণ বাইরে থাকলেই কান ধরে বাড়িতে দিয়ে যেত।

ছোট জামার কোলে জংলি পাতা, ঢেকি শাক তুলে আমাদের বাড়ির বাগানে মিছিমিছি রাঁধতাম কত পদ! বাগানের এক কোণে ছিল আমার ছোটবেলার খেলার সঙ্গী আমদের পোষা কুকুর হোবো-র কবর। প্রতিদিন স্কুল থেকে ফিরে ওর কবরে একটা করে টগর ফুল রেখে আসতাম আমি, বলতাম হোবো তুই শান্তিতে ঘুমো! হোবোর কবরের ওপর এখন বাড়ি উঠেছে, পাশের গন্ধরাজ লেবু গাছটাও নেই। কাটা পড়েছে কাঁচা মিঠে আম গাছ, ফলে ছেয়ে থাকা জলপাই গাছ সব।

বাংলা মাধ্যম স্কুলেই পড়াশুনো করেছি বেশিরভাগ সবাই। গর্ব হয় শিশুনিকেতন স্কুলের কথা, সেন্ট্রাল গার্লস স্কুলের কথা বলার সময়। টিফিনে রঙিন বাটিতে আমাদের খেতে দেওয়া হত। লাল, নীল, কমলা। কে কোন বাটি নেব তাতে ঝগড়া। অধীর আগ্রহে বসে থাকতাম আজ কী টিফিন দেবে তাই নিয়ে। কোনওদিন ডিম আলু সেদ্ধ গোলমরিচ ছড়িয়ে, তো কোনওদিন পাউরুটি আর মাংসের ঝোল। সে স্বাদ মুখে লেগে আছে যেন। যেদিন মেরি বিস্কিট আর রসগোল্লা দিত সেদিন আমার খুব মন খারাপ হত, মিষ্টি ভালবাসতাম না বলে টেবিলের ওপর মাথা রেখে শুয়ে থাকতাম। আর মাইলিদি এসে মাথায় হাত বুলোত, আস আমি খাওয়ায় দেই! মাইলিদির মুখে অনেক রেখার আঁকিবুঁকি ছিল!

গরমের ছুটিতে বা পুজোর ছুটিতে মামাবাড়ি যাওয়া ছিল মাস্ট, কবে ওই দিন আসবে তার জন্যে অধীর আগ্রহে বসে রইতাম। মাসিরা, মামারা, দিদি, বোন, ভাই, দিদুন, দাদু সবাই মিলে গমগম করত আমাদের মামা বাড়িটা। মামাবাড়ির বোধহয় একটা আলাদা গন্ধ হয়, ভারি মিষ্টি। ওখানে বকা, রাগারাগির কোনও স্থান ছিল না, শুধুই আনন্দ, হাসি, গান, মজায় ভরপুর। আম, কাঁঠাল, আমলকি, পেয়ারা কত কী ফুল গাছ! বেড়া দেওয়া সামনের গেটের বাইরে ছিল একটা কামিনী ফুলের গাছ। সন্ধেবেলা ওই গাছের তলা দিয়ে যাওয়া বারণ ছিল আমাদের, শুনতাম এই ফুলের গন্ধে সাপ আসে! যদিও কখনও চোখে পড়ে নি। দিদুন আমাদের সব ভাইবোনেদের নিয়ে গরমকালের সন্ধেবেলা বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে বসাত। ওখানে তখন নুড়ির রাস্তা ছিল আর স্ট্রিট লাইট ছিল না। দিদুন বারান্দায় মুড়ি মেখে নিয়ে আসত, আচারের তেল, চানাচুর, পেঁয়াজ আর ধনে পাতা দিয়ে। দাদুভাই আর দিদুনের ছোটবেলার গল্প শুনতে শুনতে কখন এক থালা মুড়ি উধাও বোঝাই যেত না।

থ্রি বা ফোরে পড়তে যাত্রা দেখতে গেছিলাম সদলবলে, কোনও এক মাঠে, ওটাই প্রথম এবং শেষ যাত্রা দেখা। আমরা ছোটরা সামনে বসেছিলাম সবাই মিলে, উফ কী যে আনন্দ হয়েছিল! সারারাত যাত্রা দেখে ভোরবেলায় চোখ ডলতে ডলতে বাড়ি ফিরে!

মামাবাড়ির বোধহয় একটা আলাদা গন্ধ হয়, ভারি মিষ্টি। ওখানে বকা, রাগারাগির কোনও স্থান ছিল না, শুধুই আনন্দ, হাসি, গান, মজায় ভরপুর। আম, কাঁঠাল, আমলকি, পেয়ারা কত কী ফুল গাছ! বেড়া দেওয়া সামনের গেটের বাইরে ছিল একটা কামিনী ফুলের গাছ। সন্ধেবেলা ওই গাছের তলা দিয়ে যাওয়া বারণ ছিল আমাদের, শুনতাম এই ফুলের গন্ধে সাপ আসে! যদিও কখনও চোখে পড়ে নি।

পরদিন ঘুম ভাঙে যখন তখন দেখি প্রায় দুপুর হয়ে গেছে।

বিকেলে প্রায় রোজই চলে যেতাম সামনের পার্কটাতে। মা, মাসিরাও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে দোলনায় চড়ত, আমরা কী হাসতাম দেখে! ভাগ্যিস তখন মোবাইলে ছবি বা সেল্ফি তোলার ব্যাপার ছিল না! আর দুর্গাপুজো নিয়ে প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু ভাল স্মৃতি রয়েছে। বিশেষ করে দশমীর দিন বিসর্জন হয়ে গেলে ঘরে ফেরা গুটিগুটি পায়ে আর মায়ের গম্ভীর গলা, অনেক হয়েছে এবার পড়তে বসতে হবে কিন্তু! তখন বইপত্র খুলে চোখে ঝাপসা দেখার উপক্রম, অক্ষরগুলো যেন বই থেকে উঠে শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছে এমন হত! উফ কান্না পেত তখন।

টুকরো টুকরো কত্ত এমন ছবি মনের হার্ড ডিস্কে সেভ করা রয়েছে গুনে শেষ করা যাবে না, আর ডিলিটও করতে পারবে না কেউ, পার্মানেন্ট মার্কার দিয়ে গেঁথে আছে যেন! সেগুলি সোনালি দিনের কথা, জ্বলজ্বল করবে সারা জীবন।

রাসায়নিক রস

চিজ বহোৎ ইলেকশানদার হ্যায়

ইলেকশান এলেই হেব্বি ফুর্তি হয় সার! সেদিন সার পাড়ায় পোগ্রাম ছিল। ওই আপনারা সাউথ বেঙ্গলে যেটাকে মাচা বলেন, সেটা। তা সার পাড়ায় আবার অনেক লিটারেট-এডুকেটেড পাব্লিক আছে, তাই শুরুর দিকে ইন্টেলেকচুয়াল জিনিসপত্র ছিল। সেইখানে তিন জন মাইকের সামনে বসে ভয়েজ দিয়ে অ্যাক্টিং করল। দাদা বলল, একে বলে সুতি নাটক।

তা সার, ইলেকশন হল গিয়ে পোতিস্‌সুতি নাটক। দুটোয় খুব মিল পেলাম সার। ভাষণ দিতেও মাচা লাগে, সুতি নাটকেও লাগে। পোতিস্‌সুতি মাইকের সামনে দিতে হয়, নাটকও সেম। ভোটের আগে এই নাটকটা দেখতে সার আমার সে-ই লাগে! কী সুন্দোর পোতিস্‌সুতি দেয়! পুরো পরোটা সার! কোত্থাও ভুল নেই। সব জায়গায় সমান ভাজা।

একবার কী হল জানেন সার? এক নেতা হেলিকপ্টারে এক রিমোট ভিলেজে নেমে পাব্লিককে জিগ্যেস করল, 'আপনাদের সমস্যা দূর করতে এসেছি। দয়া করে সমস্যাগুলো বলুন।'

গ্রামের পোধান বলল, 'আমাদের বাবু দুটো মেইন সমস্যা। প্রথমটা হল, ডাক্তার নাই।'

শুনেই নেতা ফোন লাগাল জানি কাকে। ইংরিজিতে কী সব অর্ডার দিয়ে পোধানকে বলল, ডাক্তার ধরে নিন এসেই গেছে। এবার সেকেন্ডটা বলুন।'

পোধান অনেকক্ষণ মাথা চুলকে বলল, 'বাবু রেগে যাবেন না তো?'

নেতা বলল, 'আরে না না! সমস্যা তো থাকতেই পারে।'

পোধান আরো তিন মিনিট মাথা চুলকে বলল, 'দ্বিতীয় সমস্যা হল আমাদের গাঁয়ে মোবাইল নেটওয়াক নাই!'

বুঝতেই পাচ্ছেন সার, ভোট না এলে এমন ফ্রি কমেডি কোথাও মিলবে না। নেতাদের ভাষণ কালেকশন করে টিভিতে একটা সিরিয়াল চালাতে পারে সার! তবে কি জানেন সার —সাইকোলজি বলে মনু যে বইটা লিখেছিলেন, সেখানে বলেছে পোতিস্‌সুতি শুনতে আমরা লাইক করি। নইলে পনের লাখ টাকার ব্যাপারটা হজম করলাম কী ভাবে? আবার শুনছি রাউল গান্দি বলছে, মাসে ছ-হাজার... কিন্তু বউ-এর হাতে দেবে। কী সাঙ্ঘাতিক পোতিস্‌সুতি সার! বিশ্বাস করলেও নেই না করলেও নেই। দিদি বলছে, একশো দিনের কাজ ডাবল হয়ে যাবে। বাপ রে! একশ দিনের কমিশন খেয়েই নিধিরাম বর্মন দোতলা তুলে ফেলল, দুশো দিনে তো মালটা টাওয়ার বানিয়ে দেবে!

আমার গুরুদেব আমাকে বলেছেন, পলিটিক্সে চিরশত্তু বলে কিছু হয় না। তাই সার চিরফ্রেন্ড বলেও কিছু হয় না। এগার সালের পর যখন ইনক্লাব ছেড়ে বন্দেমাতর্‌ বলা নিয়ে দোটানা চলচে, তখন গুরুদেব আমাকে সব ক্লিয়ার কাট করে দিয়েছিলেন। আমি সার জন্মেছি দুটো পয়সা রোজগার করে পেট চালাব বলে। কেউ আমার পার্মানেন্ট শত্তুও না ফ্রেন্ডও না। যে পাওয়ারে আমি সার তাঁকেই হেল্প করি। গুরুদেব ক্লিয়ার করে দিয়েচেন, পলিটিক্স বুঝতে হয় না, কত্তে হয়।

তবে সার সিনেমার হিরো-হিরোইনরা পার্থি হলে সে-ই জমে! ডুয়ার্সে সার দু-একটা হিরো-হিরোইন দিত তো আরো জমত। মিমিকে ফালতু যাদবপুরে দিল সার! দিদি ওকে কোচবিহারে দিয়ে দিত। ফাটিয়ে জিত্ত!

তবে একটা ব্যাপার সার একটু কনফিউজড লাগচে। সেন্টাল ফোর্স্‌স্‌ জিনিসটা কার? এটা কি গম্মেন্টের, নাকি মোদিজির, নাকি আর্মির, নাকি পুলিশের —ঠিক বুজতে পাচ্ছি না। দেকুন সার! ইলেকশানে দুটো বোমা না পড়লে, ওয়ান শটার থেকে কয়েক রাউন্ড না বেরলে ব্যাপারটাই কম্প্লিট হয় না। সেন্টাল ফোর্স্‌স্‌ ব্যাপারটা ক্লিয়ার না হলে ছক কষব কী করে? বুথ জ্যাম এখন বোকারা করে। ব্যাকডেটেড হয়ে গেছে সার। এখন সার পুরো জ্যাম। তবে এ নিয়ে বেশি আস্কিং করবেন না।

একটা ব্যাপার সার ঠিক যে আগে এসব করে মজা ছিল। সেবার সার পাতিরাম সোসাইটির ইলেকশান হল কালচিনির কাছে। সতের জন ভোটার। তিন জন আসল না। তবু সার আমাদের পার্থিকে দশ-আটে বের করে আনলাম। তবে খাটনি ছিল। আসল কথা সার উইনিং। হাজার ভোটে জেতা এমপি কি তিন লাখ ভোটে জেতা এমপি-র চাইতে কম পায়? পাল্লামেন্ট ইলেকশান মানে কম-বেশি লাখ খানেক মাজ্জিন রেখে বেরিয়ে যাও। সবু বুথকে বলে দাও, ভাই! অল্প অল্প লিড দিবি। ড্রপে ড্রপেই তো সাগর হয়। সিপিয়েম এটা দারুণ বুজত সার। পার্টিটার থাকা দরকার। নইলে এই সব ফাইন আর্টস ফিনিশ হয়ে যাবে। ইলেকশানে নামার মূল কথা হল, অল্প মার্জিনে জেতো, লেকিন বার বার জেতো।

আপনি আচাজ্জ ভগবান চন্দ্রের নাম শুনেচেন সার? আমার গুরুদেব। কেদারনাথে বিরাট আস্রোম। তিনি আমাকে বলেছেন, পলিটিক্সে চিরশত্তু বলে কিছু হয় না। তাই সার চিরফ্রেন্ড বলেও কিছু হয় না। এগার সালের পর যখন ইনক্লাব ছেড়ে বন্দেমাতর্‌ বলা নিয়ে দোটানা চলচে, তখন গুরুদেব আমাকে সব ক্লিয়ার কাট করে দিয়েছিলেন। আমি সার জন্মেছি দুটো পয়সা রোজগার করে পেট চালাব বলে। কেউ আমার পার্মানেন্ট শত্তুও না ফ্রেন্ডও না। যে পাওয়ারে আমি সার তাঁকেই হেল্প করি। গুরুদেব ক্লিয়ার করে দিয়েচেন, পলিটিক্স বুঝতে হয় না, কত্তে হয়। তবেই জাস্ট থিঙ্ক করুন সার, পোতিস্‌সুতি নাটকের কোনও ভ্যালু নেই। তবে নাটক কত্তেই হবে।

এ কালের পলিটিক্স সার জেতা দলে থাকার পলিটিক্স। তা ছেড়ে দিন সার! চলুন। একটা নতুন বার খুলেচে। দু-পাত্তর খাওয়াবেন।

অনু ঘটক

ডুয়ার্সের বই। রংরুট-এর বই

আমাদের বইপত্র এখন নিজের ঠিকানাতেই পেতে পারেন

বিষয় ডুয়ার্স

তিস্তা - উৎস থেকে মোহনা। অভিজিৎ দাশ। ২৫০ টাকা
ডুয়ার্স থেকে দিল্লি। দেবপ্রসাদ রায়। ১৫০ টাকা ***
চায়ের ডুয়ার্স কী চায়? গৌতম চক্রবর্তী ১১০ টাকা
ডুয়ার্সের চা অবলুপ্তির পথে? সৌমেন নাগ। ১৫০ টাকা ***
আলিপুরদুয়ার। প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ২৫০ টাকা
কোচবিহার ২য় সংস্করণ। প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ২৫০ টাকা

ডুয়ার্সের গল্প সংকলন

ডুয়ার্সের গপ্পোসপ্পো। সাগরিকা রায়। ১৫০ টাকা
চারপাশের গল্প। শুভ্র চট্টোপাধ্যায়। ১০০ টাকা ***
লাল ডায়েরি। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা ***
সব গল্পই প্রেমের নয়। হিমি মিত্র রায়। ১৬০ টাকা

পেপারব্যাক সিরিজ

ডুয়ার্সের দশ উপন্যাস। সংকলন। ১৯৫ টাকা
তরাই উৎরাই। শুভ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৬৫ টাকা
লাল চন্দন নীল ছবি। অরণ্য মিত্র। ১১০ টাকা
অন্ধকারে মৃত্যু-আলিঙ্গন। বিপুল দাস। ৫৫ টাকা
মেঘের পর রোদ। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ৫৫ টাকা
কুহুলিয়াদের দেশে। সুকান্ত গাঙ্গুলী। ৫৫ টাকা

ডুয়ার্সের কাব্য চর্চা

পঞ্চাশ পর্যটন শেষে মাধুকরী ধান। অমিত কুমার দে। ২৫০ টাকা
ডুয়ার্সের হাজার কবিতা। অমিত কুমার দে সম্পাদিত। ৫০০ টাকা
বোধিবৃক্ষ ছুঁয়ে এক চির ভিক্ষুক। অমিত কুমার দে। ২৫০ টাকা

বিষয় পর্যটন

আমাদের পাখি।
তাপস দাশ ও উজ্জ্বল ঘোষ। ৪৯৫ টাকা
সিকিম। সংকলন। ২০০ টাকা ***
নর্থ ইস্ট নট আউট।
গৌরীশংকর ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা
রংরুটে হিমালয় দর্শন।
সংকলন। ২০০ টাকা ***
উত্তরবঙ্গের হিমালয়ে।
প্রদোষ রঞ্জন সাহা। ২০০ টাকা ***
সব্যসাচীর সঙ্গে জলে জঙ্গলে। সংকলন
১৫০ টাকা ***
মধ্যপ্রদেশের গড় জঙ্গল দেউলে।
সুভদ্রা উর্মিলা মজুমদার। ২০০ টাকা ***
সুন্দরবন অনধিকার চর্চা।
জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী। ১৫০ টাকা ***

প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন। তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস। ১১০ টাকা
জয় জল্পেশ। শুভ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ৯০ টাকা

অরণ্য কথা বলে।
শুভ্রকান্তি সিনহা। ১৫০ টাকা ***
সে আমাদের বাংলাদেশ।
গৌতম কুমার দাস। ২০০ টাকা
পাসপোর্ট প্রতিবেশিদের পাড়ায়।
দীপিকা ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা ***
তিন মহাদেশ দশ দিগন্ত।
শান্তনু মাইতি। ১৭৫ টাকা

বাড়িতে বসেই অর্ডার দিন আমাদের বই। পেয়েও যাবেন নিজের ঠিকানাতেই।

হোয়াটসঅ্যাপ করুন ৬২৯৭৭৩১১৮৮ নম্বরে

ন্যুনতম ৩০০ টাকার অর্ডার দিতে হবে। ৫০০ টাকা বা তার বেশি অর্ডার দিলে ডিসকাউন্ট মিলবে ২০%।
পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কোনও ঠিকানায় ক্যুরিয়ার খরচ লাগবে না।

আমাদের বই যে সব দোকানে পাওয়া যায় (বই না পেলে অর্ডার করুন)

কলকাতা: দে'জ ও দে বুক স্টোর, কলেজ স্ট্রিট। **রিড বেঙ্গলি বুক স্টোর** ৪২ এ সর্দার শংকর রোড, কলকাতা ২৯। ফোন ৮১০০৯০৫৫৬৬

শিলিগুড়ি: বিশ্বাস বুক এজেন্সি, হিলকার্ট রোড বাটা গলি। **জলপাইগুড়ি: ভবতোষ ভৌমিক** কমার্স কলেজের বিপরীতে **আলিপুরদুয়ার: ম্যাগাজিন সেন্টার** কলেজ হল্ট। **কোচবিহার: দাস নিউজ এজেন্সি** বড় পোস্টাপিসের বিপরীতে। **ফালাকাটা:** পাঞ্চজন্য। **মালবাজার: বইঘর,** আদর্শ বিদ্যাপীঠের উল্টোদিকে। **বিন্নাগুড়ি:** সিটি বুক স্টল। **বানারহাট:** গ্রন্থ ভারতী। **বীরপাড়া:** পোকিসা। **মালদা:** পুনশ্চ। **রায়গঞ্জ:** ধানসিঁড়ি।

অনলাইনে কিনুন আমাদের বইপত্র www. readbengalibooks.com

জলপাইগুড়ি বইমেলা

জলপাইগুড়ি বইমেলা শুরু হল ২১মার্চ দোলের সন্ধ্যায়। এ বইমেলা বাকি সব বইমেলা থেকে অনন্য। সংস্কৃতির প্রশ্নে সব রং মিলেমিশে একাকার হয় এখানে। জেলার ১৫০ বছর পূর্তির বৃহত্তম উদযাপন। উদবোধনে মঞ্চস্থ হল 'এখন ডুয়ার্স'-এর প্রযোজনায় একটি তিস্তাবন্দনা আলেখ্য 'নাও বেয়ে যায় তিস্তাবুড়ি'। রচনা— শুভ্র চট্টোপাধ্যায়। তিস্তার উৎপত্তি এবং দীর্ঘ প্রবাহপথ পাড়ি দিয়ে সমতলে প্রবেশ আর সেই সাথে উত্তরবঙ্গের জীবনরেখা এই নদীর দু'পাশে বিধৃত জনজীবনের সংস্কৃতির ছাপ এই নদীকে ঘিরে যেভাবে আবর্তিত হয়, তার অসামান্য প্রকাশ এই আলেখ্য। সামগ্রিক পরিকল্পনা ও আবহ সব্যসাচী দত্তের। কণ্ঠে— কঙ্কনা নন্দী, শুভ্র চট্টোপাধ্যায় এবং দীপঙ্কর রায়। সৃজনী নৃত্যে— রিদমডান্স আকাদেমি ও সৃষ্টি মাইম থিয়েটার, জলপাইগুড়ি। তারপর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল তিনটি বইয়ের। অভিজিত দাশের 'তিস্তা উৎস থেকে মোহনা', শুভ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'তরাই উতরাই' এবং তনুশ্রী পাল সম্পাদিত 'তিস্তা নন্দিনী গদ্য সংগ্রহ ২০১৯'।

প্রকাশিত হল শালবনে রক্তের দাগ

নারী দিবসের সন্ধ্যা জমজমাট ছিল শিলিগুড়ির ইচ্ছেবাড়িতে। 'ফুলেশ্বরী নন্দিনী' সংস্থার সদস্যদের উষ্ণ উপস্থিতিতে ও সহ-উদ্যোগে প্রকাশিত হল 'এখন ডুয়ার্স' প্রকাশনার বই সাগরিকা রায়ের থ্রিলার 'শালবনে রক্তের দাগ'। প্রকাশ করলেন উত্তরের বর্ষীয়ান সাহিত্যিক মিনতি রায়, সঙ্গে ভ্রামণিক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, ভাষাবিদ ও সাহিত্যিক গৌরবরণ রায় ও বিমলেন্দু দাম। লেখক প্রকাশক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক তপন রায় প্রধান, বিশিষ্ট কবি লেখকরা। গানে, কথায়, সম্মাননায়, কবিতা ও গল্পপাঠে ঘণ্টা তিনেক কোন দিক দিয়ে কেটে গেল বোঝাই গেল না!

টিম অ্যালবাট্রস

গত পাঁচ বছর ধরে যাঁরা 'এখন ডুয়ার্স' ছেপে বাঁধাই করে পাঠকের কাছে নিয়মিত পৌঁছে দিয়েছেন সঠিক সময়ে, তাঁদের জন্য আমাদের সবার পক্ষ থেকে হার্দিক অভিনন্দন। আমরা আশা করব আগামী পাঁচ বছরও একই সঙ্গে হবে আমাদের পথচলা। কেবলমাত্র পত্রিকাই নয়, 'এখন ডুয়ার্স' প্রকাশনার সমস্ত বই, যা প্রথম দর্শনেই পাঠকের মন জয় করে নেয়, তার সিংহভাগ কৃতিত্বের দাবিদার নিঃসন্দেহে এই টিম অ্যালবাট্রস।

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 3 Rajdanga Gold Park, Kolkata 700107, Editor - Pradosh Ranjan Saha.